কারটুন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভাইপো মণির বড় ইচ্ছে, তার নামটা

ছাপার হরফে একবার দেখ্‌বে

তাই, তার নাম—

শ্রীমান্ হিমাদ্রি ভট্টাচার্য্য

বড় হরফে ছেপে,

বইটা তা'কেই দিলাম।

কার্টুন

ভূমিকা

উপন্যাসের ভূমিকা ফ্যাসন-বিরুদ্ধ হইলেও, আমার নিজের কিছু বলিবার আছে; কারণ বাজারে যে সব উপন্যাস আজকাল চলে এখানি তাহার সগোত্র নহে, ইহার কিছু স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। তবে সে বৈশিষ্ট্য হয় ত বা এর অ-বিশেষণই হইবে। বাংলা-সাহিত্যে সত্যিকার Serio-comic উপন্যাস আছে কিনা জানি না, তবে এই কায়্টুনে আমি তাহারই চেষ্টা করিয়াছি।

কায়্টুনের বগলা, বিনোদ ও বিপিন বিংশশতকের তিনটি Don-Quixote, অতএব ঘটনা, পরিস্থিতি প্রভৃতি বাস্তব কি অবাস্তব সে বিষয়ে যুক্তি-তর্কের অবসর নাই। সে সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎও আমার নাই, তবে যা প্রকৃতই ঘটে তা অনেক সময়ই উপন্যাসকে ছাড়াইয়া যায়। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে Don-Quixote-এর নূতন কি প্রয়োজন ছিল? তাহার উত্তরে স্যর ওয়ালটার র‍্যালের মতই বলিব, আমরা এই জগত, এই বহু আকাঙ্ক্ষিত সভ্যতাকে যেরূপ দেখি, অন্য দিক হইতে দেখিলে সেটা ঠিক সেরূপ থাকে না। কে বলিতে পারে, এই জগতের, এই যান্ত্রিক সভ্যতার, বড় সার্থকতাই ইহার বড় ব্যর্থতা কিনা? মানুষ যাহা ভাবে, যাহা করিতে চাহে, তাহা প্রকাশ করিলেই সে পাগল হয় কিনা, তাহা আমরা কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছি! প্রত্যেকের অন্তরেই অমনি সুপ্ত একটি পাগল সভ্যতার পাষাণ-ভারে হয়ত রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া রহিয়াছে! মানুষের মনোবৃত্তি সত্যই উন্নতি করিয়াছে কি?

উপন্যাস ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার কোনও বিনীত নিবেদন নাই,—আমি জানি, সকলেই শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ হয় না। তবে আমি যাহা বলিতে চাহিয়াছি তাহা যদি বলা হইয়া থাকে, তাহা যদি পাঠকগণের অন্তরে প্রশ্ন জাগায় তবে সেই আমার প্রচেষ্টার যথার্থ সার্থকতা।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'কায়টুনের' মত সৃষ্টিছাড়া উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ যে এত শীঘ্র প্রয়োজন হইবে তাহা ভাবি নাই—সেই সঙ্গে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি এই ভাবিয়া যে বাংলার পাঠকগণ উপন্যাস পাঠের সহিত ভাবিতে চাহিতেছেন নিছক গল্পই নয় তাহার সহিত মনের খোরাক চাহিতেছেন।

আমার যাহা কৈফিয়ৎ তাহা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়ই জানাইয়াছি। আমার বগলা, বিপিন ও বিনোদের অনিবার্য্য পরিণতি যদি আপনাদের করুণা জাগাইয়া থাকে তবে বাস্তবের এমনি অভাগ্যের দলও একদিন আপনাদের করুণা লাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারিবে এই আশায়ই সংশোধিত 'কায়টুন' পুনরায় আপনাদের দ্বারস্থ।

আমভৈল নহাটা
যশোহর
২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৫২ সাল

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কার্টুন

তিন বন্ধু, তিনটি মাদুর ; ঘর একখানা।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ব্যারাক। দোতালা ঘর—সাম্‌নেই একটা পচা এঁদো পুকুর, তার ওপারে একটা খোলার বস্তি। বস্তির মেয়েরা ঘাটে বসিয়া মেটে সাবান মাখে। তারপরে বড় বাড়ী—তিনতলা, চারতলা, বিজলী বাতির সমারোহ অন্ধকার রাত্রে ব্যারাকটাকে যেন পরিহাস করে ; দিনে ইলেকট্রিক পাখা অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া চলে।

ঘরের তিনটি প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া তিনটি মাদুর পাতা ; উত্তরে চিত্রশিল্পী বিনোদের মাদুরে স্কেল কম্পাস, কাগজ-তুলি ছড়ানো। শিয়রের কাছে সর্ব্বরঙ-সমন্বিত কালো জলের গামলা। বিনোদ মনোযোগী, সর্ব্বদাই শিল্প-সাধনারত। দক্ষিণে কবি বিপিন স্তূপীকৃত মাসিক পত্রিকার মধ্যে সমাধিস্থ। কখনও কবিতা লেখে, কখনও ভাঙা বেহালায় সুরের আলাপ করে। পশ্চিমে বগলার মাদুর—কাগজপত্র সমাকীর্ণ।

বেলা প্রায় এগারটা, বাহিরে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র ঘরখানাকে তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ঘর্ম্মাপ্লুত বিনোদ ছবির উপর হইতে তুলিটা উঠাইয়া পূর্ব্বোক্ত গামলায় নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—বিপিন, আজ মঙ্গলবার নয় ?

বিপিন ক্যালেণ্ডার দেখিয়া কহিল—না, কাল।

এই বার-হিসাবের কিছু তাৎপর্য্য আছে। আজকাল অর্থের অনটনে নিত্য ভাত খাওয়া হইয়া উঠে না, তাই সপ্তাহে তিনদিন ভাত এবং অন্যান্য দিন যা-হয়-কিছু খাইয়াই কাটাইতে হয়। বিনোদ ব্যথিত স্বরে বলিল—আজ মঙ্গলবার নয়, কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে যে!

বিপিন বেহালায় ছড় ঘর্ষণ থামাইয়া কহিল—অনেকদিন মাংস খাওয়া হয়নি—আজ মাংসই হোক। কি বল?

সাহিত্যিক বগলারঞ্জন এতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলেন। মাংসের প্রসঙ্গে সহসা উঠিয়া, অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ির একটা পরিত্যক্ত অংশ ধরাইয়া বলিল,—মাংসের কি কথা বলছিলে?

চোখ দু'টি তার মাংসের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! কাল সমস্তটা দিন এবং রাত্রি মুড়ি বেগুনীতেই চলিয়া গিয়াছে। আজ সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। সমস্ত পকেটগুলি খুঁজিয়া দেখা গেল, কিন্তু পয়সা মিলিল না।

খালি পকেটগুলি আর একবার অভিনিবেশ সহকারে খুঁজিয়া লইয়া বিনোদ একান্ত হতাশার সুরে কহিল—তবে আর কি? চল স্নান করে এসে লম্বা ঘুম দেওয়া যাক্, যা হয় করা যাবে বিকেলে।

সকলে স্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বগলা দগ্ধ বিড়িটায় সজোরে টান দিয়া কহিল—স্নানে ক্ষুধার বৃদ্ধি। ধূম উদগীরণ করিয়া সে পুনরায় শুইয়া পড়িল।

বারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময় গাঢ় নিদ্রাতেই কাটিয়া গেল। পশ্চিমের বড় বড় বাড়ীগুলির ওপারে সূর্য্যও ডুবিয়া গেল, কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্য-সমস্যাটা মিটিল না।

সহসা কবি এক চীৎকারে সকলকে সচকিত করিয়া দিল—ভাই,

আজ রাত্রে একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে। সকলে একত্রিত হইয়া দেখিল তারিখ হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। বগলা সোৎসাহে কহিল—তবে যাহোক্ পারবি তো?

কবি বিপিন গর্ব্বোন্নত বুকে টোকা দিয়া কহিল—খুব—

—দু'জনের কিন্তু।

নূতন আর এক সমস্যার সৃষ্টি হইল কাপড়-জামা লইয়া। বিবাহ বাড়ীর আনন্দোৎসবে উপস্থিত হওয়ার মত কাপড় একখানা জুটিয়াছে, কিন্তু সার্টটির পেছন ছেঁড়া। নিকটে এমন কেহ বন্ধু নাই যে এই আসন্ন বিপদে সাহায্য করিতে পারে। বগলা সারা সন্ধ্যাটা ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু কোন উপায়ই হইল না। সকল বন্ধু ষড়যন্ত্র করিয়াই যেন একযোগে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে সাহিত্যিক হাত দোলাইয়া কহিল—এর কোন মানে হয়। এটা তাহার মুদ্রাদোষ।

ঘরের সম্মুখেই ভাগীরথী বাবুর ঘর। বগলা চিন্তান্বিত হইয়া বারান্দায় পদচারণা করিতেছিল। ভাগীরথীবাবু ডাকিয়া কহিলেন—বগলাবাবু, শুনুন শুনুন, এই দেখুন মশাই, বড়লোক বাসের ব্যাটারা যেখানে সেখানে পেরেক পুঁতে রাখে—তাদের কি আক্কেল নেই! নতুন চাদরটা মশাই সেদিন বহরমপুর থেকে বারটাকা দিয়ে এনেছি, পেরেকে বেধে ছিঁড়ে গেল মশাই, ফ্যাঁচ করে ছিঁড়ে গেল!

বগলা ভাগীরথীবাবুর ছিন্ন-চাদরের এই মর্ম্মান্তিক করুণ কাহিনী শুনিয়া সখেদে কহিল—বাস্তবিকই মাষ্টারমশায়, আহা-হা নতুন চাদরটা। আমাদের বিপিন কিন্তু বেশ রিপু করে।

মাষ্টার মহাশয় ব্যগ্রতার সহিত বগলার হাত ধরিয়া কহিলেন—এ

উপকারটুকু ক'রে দিতেই হবে মশাই—ব'লে ক'রে যেমন ক'রেই হোক্।

বগলা মৃদু হাসিয়া, চাদর স্কন্ধে ঘরে ফিরিল। ভাগীরথীবাবু নিশ্চিন্ত মনে জীর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়া ছাত্র পড়াইতে রওনা দিলেন। বিপিনও তাহার উপবাস কৃশ দেহের ছিন্ন সার্টটার উপর ভাগীরথীবাবুর চাদরটা চাপাইয়া দিয়া রওনা হইল।

সন্ধ্যার পরে বিপিনের ভাঙা বেহালায় সুর চড়াইল শিল্পী বিনোদ, যেমন বেসুরো, তেমনি বেতালা। সাহিত্যিক বগলারঞ্জন একটা এক-পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকের জন্য আধ পৃষ্ঠার গল্প লিখিতে বসিয়াছিল। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় ঘরখানা স্বল্প আলোকিত। বিনোদ বলিল—'ভাই লুচি!'

বগলার অসমাপ্ত গল্পের নায়িকার অশ্রু লুচির সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। তারস্বরে কহিল,—এঁ্যা—

আলোকোজ্জ্বল একটা বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিনোদ বলিল—ওই দেখ, ছাতে কেবল লুচি পড়ছে। ওদের না আছে ধর্ম্মজ্ঞান না আছে বুদ্ধি—যারা বড়লোক তারা তো নিত্যই খায়, তাদের জন্যে এত পণ্ডশ্রম কেন করে!

বগলার সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া গেল। উপবাস-ক্লিষ্ট হাতখানা লিখিতে পারিতেছে না, মাথাটা ভাবিতে পারিতেছে না, অথচ ওই বাড়ীতে এতবড় আয়োজন, এতখানি অপব্যয়। হাত দোলাইয়া বগলা বলিল—অত্যাচার, একসপ্লয়টেশন—এর কোন মানে হয়?

রাত্রি এগারোটায় বিপিন ফিরিল—ম্লানমুখে।

বন্ধুদ্বয়ের সাদর অভ্যর্থনায় উত্তরে বগল হইতে দিস্তাখানেক লুচি ও বেগুন ভাজা ফেলিয়া দিয়া বলিল—বেকুবের চূড়ান্ত।

বিপিন নিঃশব্দে ডান পকেটে হাত দিয়া দেখাইয়া দিল—ছেঁড়া। ইঙ্গিতে সকলেই বুঝিল, ছিন্ন পকেটের ভিতর দিয়া যাবতীয় মিষ্টান্ন পড়িয়া গিয়াছে, হয়তো বা সমাগত ভদ্রলোকদের সাম্‌নেও দুই একটি পড়িয়া থাকিবে! বন্ধুদ্বয় এই অক্ষমতার জন্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ না হইয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। বিপিন বাঁ দিকের পকেট হইতে দুইটি সন্দেশ বাহির করিয়া দিয়া কহিল,—এই দুটো অবশিষ্ট ছিল, রাস্তায় পড়েনি নেহাৎ ভাগ্যির জোরে!'

ভবঘুরে সঙ্ঘের আজকার দিনটাও অনাড়ম্বরে কাটিয়া গেল—......

ইহাদের এই বন্ধুত্ব ও একত্রবাসের সংক্ষিপ্ত একটু ইতিহাস আছে—

বিপিন ও বগলা বাল্যবন্ধু। পাশাপাশি দুই গ্রামে তাহাদের বাড়ী। প্রথম পরিচয় স্কুলের পথে লিচু চুরি করিতে গিয়া। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে বিলম্ব হইল না। বিলের ধারে উঁচু রাস্তার উপর বসিয়া উচ্ছ্বাস পূর্ণ বক্তৃতা আরম্ভ করিত—বক্তৃতার সারাংশ তাহাদের কৈশোরের অপরিণত প্রেমের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ঘটনা—বকুলতলার মালা গাঁথা প্রভৃতি। তার পরে একদিন দুজনেরই কিশোরী প্রিয়ার শুভপরিণয় হইয়া গেল অন্য গ্রামে—সেই দিন হইতে স্কুলের পথে বুড়ো বটের তলায় চোখের জল ফেলিয়া বিপিন হইল কবি এবং বগলা হইল সাহিত্যিক। ....

গ্রামের স্কুল হইতে পাশ করিয়া কলিকাতা আসিয়াছিল চাকুরী করিতে। বন্ধুদ্বয়ের চাকুরী হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল সেবার কলেরা

বন্যার জলের ন্যায় গ্রাম দুইখানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই নিষ্ঠুর করাল আঘাতে দুইজনেরই মা সারাজীবনের মত ভাসিয়া গিয়াছেন—সেইদিন হইতে ইহাদের ছুটি!

বিনোদ স্বভাব-দোষে সংসার ও বন্ধুবান্ধব হইতে বিতাড়িত। দুনিয়ার কাহাকেও গ্রাহ্য করিবার মত উপযুক্ত কারণ সে খুঁজিয়া পায় নাই। নিজের যাহা খেয়াল তাহাই করিয়াছে। জীবনে তাই আত্মীয়তার আর প্রয়োজন বা সুযোগ হয় নাই।

একদিন বিপিন ও বগলা কি একটা ফিল্ম দেখিতে গিয়াছিল। অপরিচিত বিনোদ পাশেই বসিয়াছিল। অল্প একটু আলাপের ফলেই বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল।

ফিল্মের বিষয়বস্তু ছিল নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের একটি ঘটনা। মহৎ উদার অশরীরী অতীন্দ্রিয় প্রেমের করুণ আত্মত্যাগ।

ছবি শেষ হইলে উচ্ছ্বসিত বিপিন বলিল, চমৎকার!

বগলা বলিল—মন্দ নয়, তবে, অসম্ভব।

বিপিন চীৎকার করিয়া বলিল—অসম্ভব! কি অসম্ভব?

বগলা তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—মেয়েরা ভালবাসে—এ আমি বিশ্বাসই করিনে—আর ভালবাসা কথাটা 'ফ্যালাসি'।

বিপিন ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—কি! এত অনায়াসে অত বড় কড়া কথা ব'লো না।

দুই চারিটা উষ্ণ তিরস্কার বিনিময়ের পরেই, রাস্তার মোড়ে আসিয়া মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিনোদ মধ্যস্থ হইয়া কহিল, ভাই কথাটা আমিও বিশ্বাস করিনে।

বিপিন রোষে চক্ষুকর্ণ আরক্ত করিয়া বাড়ী ফিরিল। সেইদিন হইতে বিনোদ ও বগলার বন্ধুত্ব এমন দৃঢ় হইয়া গেল যে, বিনোদ পরদিনই পোঁটলা

পুঁটলি সহ ব্যারাকের সেই অপ্রশস্ত ঘরখানায় আস্তানা ঠিক করিয়া ফেলিল।

কবি বিপিন ও বগলার এরূপ মারামারি, এমন কি রক্তারক্তিও অনেক বার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বন্ধুত্বের বন্ধন এতটুকুও শিথিল হয় নাই। তিনবন্ধু মিলিত হইবার পর এমনি করিয়াই কয়েকটা বৎসর কাটিয়াছিল। অনাবশ্যক বোধে বিপিন আর পড়ে নাই, বগলা আই, এ, ক্লাসে দুই বৎসর পড়িয়াছিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফি দিয়া উঠিতে পারে নাই, পরীক্ষাও দেওয়া হয় নাই। বিপিন একবার বড়দিনের বন্ধে দেশে গিয়াছিল, ভাগ্যচক্রে সেই বন্ধেই বিপিনের সাবেক প্রিয়া মেয়ে কোলে করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়াছিলেন। তিনি বিপিনকে ডাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—শ্বশুর তাহাকে কেমন ভালবাসেন, কবে শ্রদ্ধেয় ভাসুর ঠাকুর একটা মুখের কথায় সত্তর টাকা মূল্যের হারমোনিয়ম কিনিয়া দিলেন, কবে উনি রসিকতা করিয়া একহাট লোকের মাঝে জব্দ করিয়াছিলেন, কবে তিনি তাহার উপর ভীষণ রাগান্বিত হইয়াছিলেন, প্রভৃতি ঘটনার অতি সুদীর্ঘ তালিকা। বিপিন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া একান্ত নীরবে একঘণ্টা কালব্যাপী প্রাঞ্জল সুললিত বক্তৃতা শুনিয়া বলিল—আসি। মেয়েটি বলিল—আমি এত গল্প করলুম, আপনি ত কিছুই ব'ললেন না দাদা।

আমাদের জীবন মোটেই এমন নয়, যা'তে গল্প করার মত কিছু ঘটে, বলিয়া বিপিন বাড়ী ফিরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা আসিয়া প্রচার করিল—সেও বিশ্বাস করেনা যে, নারী ভালবাসিতে পারে। ভালবাসা নামক যে হেঁয়ালীটি চলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং মানসিক ব্যাধিরই অনুরূপ। জগতে কামনাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

তারপরে ভবঘুরে সঙ্ঘ একসঙ্গে নারী-বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এমনি করিয়া আরও কয়েকবৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকলের ঘুম ভাঙিল ন'টায়।

গতদিবসের সমস্তটা দিন এবং রাত্রি অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় কাটিয়া গিয়াছে! শরীরের সমস্ত রন্ধ্রে অবসাদ যেন অন্ধকারের মত জুড়িয়া বসিয়া আছে।

বগলা অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িটায় শেষ টান দিয়া বলিল, ভাই সকলেই যা-হয় কাজের চেষ্টায় বেরুই এস, না খেয়ে তো কলম চালানো যায় না।

কথাটা আবশ্যকীয়: সকলে সমস্বরে বলিল, হ্যাঁ একটা উপায় করা দরকারই।

বিনোদের সংসার সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, সে বলিল—সকলেই কিছু উপার্জ্জন কর, জমাখরচ লেখো, আর মিতব্যয়ী হও।

বগলা জামা কাঁধে করিয়া বলিল—চাকরীর চেষ্টায় বেরোলুম, এসে যা-হয় কিছু যেন খেতে পাই। সারাদিন ঘরে বসে থাকলে না খেয়ে একরকম পারা যায়, কিন্তু শ্রম ভীষণ অনিষ্টকর।

বিপিনও রওনা হইল! বিনোদ বলিল—চারটে পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রে পাঁচটায় বাসায় ফিরবে। আমি যা-হয় জোগাড় ক'রে রাখবো। আর যদি কিছু নাই জোটে বন্ধুবান্ধবের মেসে গিয়ে—

কথাটার শেষাংশ সকলেই জানিত; শুনিবার আবশ্যকতা ছিল না, দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

কবি বিপিন মহিলা-সঙ্কুল বিডন স্ট্রীট দিয়া চলিতে চলিতে দেখিল, কর্ম্মচঞ্চল রাস্তায় ব্যস্ত জনসাধারণ ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। ছেঁড়া পাঞ্জাবীটার পকেটে হাত দিয়া একবার দেখিল, পেন্সিল এবং কাগজ যথাস্থানেই আছে। এ দু'টি দ্রব্য কবি সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখে—অকস্মাৎ

দুর্জ্ঞেয় মনটায় যদি কোন দুষ্প্রাপ্য ভাবের প্রাবল্য দেখা দেয়, তৎক্ষণাৎ সে সেটকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, না রাখিলে শত শত চিন্তা ও অশান্তির মধ্যে যদি তার খেই একবার হারাইয়া যায় তবে তাহা আর পাওয়া যাইবে না।

বিপিন কিছুদুর গেল। তাহার ভাবপ্রবণ মস্তিষ্কে কবিতার মিল, জোনাকির মত কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ একটু সুগন্ধের ঢেউ নাকে গিয়া তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন মনটাকে সচেতন করিয়া তুলিল। দেখিল—তার পাশ দিয়াই কতকগুলি মেয়ে স্কুল বা কলেজে যাইতেছে—সোনার চুড়ি, কানের দুল রৌদ্রে ঝিল্‌মিল্‌ করিতেছে, মূল্যবান উজ্জ্বল শাড়ীর প্রান্ত বাতাসে উড়িতেছে,তাহারই সুবাসে বায়ুমণ্ডল সুবাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

বিপিন ভাবিল, এই মেয়েরাই জগৎটাকে এমনি করিয়া দিয়াছে। তাহাদের হাতের সোনার চুড়িগুলিই তাহাকে বেশী লাঞ্ছনা দিতে লাগিল—ওই চুড়ি পরিবার কোন অর্থ নাই। ওর একটা চুড়ি পাইলে কয়েকটি দিন কি আনন্দেই না যায়। চুড়িটার দাম! যদি চার টাকাও হয়, তাহা হইলে চারটে দিন পেট পুরিয়া খাওয়া চলে—একটা আস্ত পাঞ্জাবীও হইতে পারে।

বিপিন ক্রোধ-রক্তিম চোখ দুটি ফিরাইয়া লইয়া বিপরীত দিকে চলিতে সুরু করিল। আবার ভাবিয়া চলিল—এই যে নারী, অন্যের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া চুড়ি হাতে দেওয়ার প্রবৃত্তি কোথা হইতে পাইয়াছে! কারণ খুঁজিতে যাইয়া সমস্ত ব্যাপার জড়াইয়া একাকার হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বিপিন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিল,—জগতে অন্যের চেয়ে নিজেকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নীচ প্রবৃত্তি ছাড়া ইহার কোন ব্যাখ্যা হয় না—নিজের স্বার্থটুকু আগুলিয়া থাকিবার মত নীচ সঙ্কীর্ণতা!

একটি বৃদ্ধা ভিখারিণী বিপিনের সামনে ভিক্ষাপাত্র ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল—এ বাবুজী

চিন্তাশ্রান্ত বিপিন চারিপাশে একবার চাহিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে একদল স্কুলযাত্রী, ছাত্রীকে দেখাইয়া দিয়া পুনরায় বিপরীত দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

হেদোর মোড়ে দাঁড়াইয়া বিপিন অনুভব করিল, তাহার দুর্ব্বল পা দুইখানি শক্তিহীন এবং অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। টাইলসেডের নীচে একটা বেঞ্চি দখল করিয়া বিপিন কবিতা লিখিতে সুরু করিল—

আমি নারী-বিদ্রোহী—
জগতের বুকে জ্বালি দাবানল মম অন্তর দহি।

পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী উত্তেজনাপূর্ণ এক কবিতা লিখিয়া বিপিন সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, রাস্তায় তীব্র রৌদ্র ঝিল্‌মিল্‌ করিতেছে, তাহার দিকে তাকানাও যায় না। বেঞ্চিখানার উপর সমস্ত দেহখানা সম্প্রসারিত করিয়া শুইয়া পড়িল। পাঁচমিনিটের মধ্যে চোখের পাতা ঘুমঘোরে জড়াইয়া আসিল।

বগলা বাড়ী হইতে সোজা অফিস-পল্লীতে রওনা হইয়াছে। কিন্তু কলেজ স্কোয়ারে পৌছিয়াই তাহার সুস্থ মস্তিষ্কে সহসা যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। তাহার উপযুক্ত কারণও ছিল—

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে এক সৌখিন যুবক নব-পরিণীতা স্ত্রীকে লইয়া বাজার করিতে আসিয়াছিলেন। এই অতি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করিয়াই বগলা উত্তেজিত মস্তিষ্কে ভাবিতে লাগিল—এই যে নারীর খেয়াল, অন্যায় আব্দারের কাছে এমন কাঙালের মত আত্মসমর্পণ, এর কোন মানে হয়! তুচ্ছ একটি মেয়ের

অঙ্গরাগের উপাদানের জন্য অকাতরে এই অর্থব্যয়; এ যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি অন্যায়।

বগলা দ্রুত ছুটিতে লাগিল।

দ্বারের উপরেই 'নো ভেকান্সি' টাঙানো। তবুও জোর করিয়াই সে ঢুকিয়া পড়িল। কর্ম্মতৎপর এক বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিল—বড়বাবু কাঁহা?

বেয়ারা পর্দ্দানশীন একটি ঘরের দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া দিল। বগলা ঘরে ঢুকিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বড়বাবু বলিলেন,—কি প্রয়োজন! কণ্ঠস্বর যেমন কর্কশ তেমনি গম্ভীর।

বগলা বলিল—একটা চাক্‌রী না হ'লে আর চ'লছে না, তাই এলুম—একটা যা-হয় কিছু দিন।

বড়বাবু দরজার উপরকার বিজ্ঞপ্তি দেখিতে অনুরোধ করিলেন, বগলা তাচ্ছিল্যর সহিত বলিল,—ও দেখেছি।

—তবে আর কেন খাম্‌কা বিরক্ত করেন?

—আমার চ'লছে না তাই, চাকরী খালি না থাকে, আপনি অনেক টাকা মাইনে পান, তার থেকে তিরিশ টাকা দেবেন, যা পারি আপনার সাহায্য ক'রবো।

বগলার কথার ভঙ্গি মোটেই বিনয় নম্র নয়, কাজেই বড়বাবু একটু পরেই রুষ্ট স্বরে 'গেট্ আউট' এর আদেশ করিলেন। বগলা ক্ষীণ একটু হাসিয়া নমস্কার জানাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

জনাকীর্ণ রাস্তায় পা দিয়া বগলা ভাবিল, চাকুরীর জন্য চেষ্টা ত যথেষ্টই করা গেল, এখন বিশ্রাম আশু প্রয়োজন।

সামনে একটি পার্কে চমৎকার ছায়া পড়িয়াছে, ঝির ঝির করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়াও বহিতেছে, স্থানটি লোভনীয়। সবুজ ঘাসের গালিচার উপর হাত পা ছড়াইয়া দিয়া বগলা শুইয়া পড়িল। ট্রাম বাসের শব্দে তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়, বগলা তবুও জোর করিয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত চোখ বুজিয়া রহিল।

বেলা দ্বিপ্রহরে বারান্দার রৌদ্র আসিয়া পড়িলে বিনোদ লাল রংমাখা তুলিটা গামলার জলে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের ঘরে দুর্দ্দম গর্জ্জনে ষ্টোভ জ্বলিতেছিল। বিনোদ চিন্তা করিয়া বুঝিল—রান্না হইতেছে।

দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিলেন—আসুন, আসুন বিনোদবাবু। নোতুন কি ছবি আঁকছেন?

বিনোদ জীর্ণ মাদুরের প্রান্তে বসিয়া কহিল,—হ্যাঁ একখানা আঁকছি বটে।

ইলিশ মাছ, বেশ তৈলাক্ত। ষ্টোভের উপরে মাছের ঝোল হইতেছিল। বিনোদ লুব্ধ দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল,—মাছ কত ক'রে এনেছেন?

—দশ আনা।

—মাছের দাম তো অনেক তা হ'লে—আপনার রান্না তো বেশ, ঝোলের রংটা খুলেছে ভাল।

বিনোদের প্রশংসায় ভদ্রলোক স্মিতহাস্যে বলিলেন—হ্যাঁ মশাই, চিরকাল হাত পুড়িয়েই খাচ্ছি—না হওয়াই আশ্চর্য্য। তা একটু বসুন বিনোদবাবু। এই চালটা এনেছিলাম, কিন্তু বড্ড মোটা; এইটে ফেরৎ দিয়ে আসি,—এসে গল্প করা যাবে এখন।

বিনোদ সাগ্রহে কহিল—দেখি দেখি, কেমন চাল! কত ক'রে এনেছেন?

—দশ পয়সা।

—তা আমরা তো এই চালটাই খাই, ফেরত দিয়ে আর কি হবে! আধসের নয়? আমাদেরই দিন, কাল পয়সা দেব এখন।

—তা নিন্ নিন্, পয়সা যখন হয় দেবেন, তার জন্যে কি! আপনারা শিক্ষিত লোক—

কয়েক মিনিট বাজে গল্পের পর, বিনোদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। পুরাতন জীর্ণ, ষ্টোভটা নাড়িয়া দেখিল একেবারেই শূন্যোদর হইয়া গিয়াছে। লণ্ঠনেও কেরোসিন তৈল আছে যৎসামান্য।

বিনোদের সায়ান্স পড়া ছিল। ভাবিল, চাউল সিদ্ধ করিতে উত্তাপ প্রয়োজন। আধ ঘণ্টায় অগ্নির উত্তাপে যদি সিদ্ধ হয়, তবে পাঁচ ঘণ্টায় সূর্য্যের উত্তাপে কেন হইবে না? বিশেষতঃ এখন কলিকাতার উত্তাপ ১১০° ফারেনহাইট অন্ততঃ অভিজ্ঞতা তো হইবে!

বিনোদ মনে মনে করপোরেশনকে ধন্যবাদ দিল, ভাগ্যে জল কিনিতে নগদ পয়সা লাগে না! চাল জলে দিয়া, রৌদ্রে রাখিয়া বিনোদ ক্লান্তদেহে শুইয়া পড়িল।

আফিস কোয়ার্টারের পার্কে ঘুম হইতে উঠিয়া বগলা সমস্ত পকেট নিপুণতার সহিত হাতড়াইয়া দেখিল, একখানা সেফ্‌টি ক্ষুরের ব্লেড্ ছাড়া আর কিছুই নাই। সমস্ত দেহটা একেবারে ক্লান্ত, বাসাও দুই মাইল দূরে, দেহে হাঁটিবার মত শক্তি নাই। বগলা কিছুক্ষণ একাগ্র মনে চিন্তা করিল, কি উপায়ে বাড়ী পৌছান যায়। বাড়ী যাইয়া উঠিতে পারিলে যা হয় একটা কিছু জুটিবেই। বিনোদ ছুখোড় ছেলে, তার

বুদ্ধিমত্তার উপর বগলার প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। বগলা নিবিষ্ট মনে ব্লেড দিয়া পকেট কাটিতে লাগিল।

দোতলা বড় বাসের কণ্ডাক্টর হাঁকিল, শ্যামবাজার। বগলা ছুটিয়া বাসে উঠিল। যথাসময়ে ভাড়া চাহিলে সে পকেটে হাত দিয়া আতঙ্কিত স্বরে কহিল—এ্যাঁ—

বাসের অভ্যন্তরস্থ ভদ্রলোকগণ দেখিলেন, বগলার মণিব্যাগ প্রকাশ্য দিবালোকে তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। কণ্ডাকটর নামিয়া যাইতে বলিল। এক দয়াবান ভদ্রলোক পয়সা দিয়া বগলাকে সাহায্য করিলেন। বগলা তাহার ঠিকানাটা লইয়া, অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নামিয়া পড়িল।

বিপিন ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল, স্কুল কলেজ ছুটি হইয়া গিয়াছে। রচিত কবিতা পুনরায় পাঠ করিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। বিপিন উৎসাহে বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

পাঁচটায় তিনবন্ধুতে সমবেত হইয়া দেখিল, বিনোদের বিজ্ঞান পড়া একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেছে। চাল তো সিদ্ধ হয়ই নাই, একটু নরম হইয়াছে মাত্র।

বন্ধুগণ একত্রে ভিজা চাউল চিবাইতে চিবাইতে বিপিনের মস্তিষ্ক প্রসূত অভিনব কবিতার রসাস্বাদন করিতে লাগিল।

আহারান্তে বগলা সমস্ত ঘর খুঁজিয়া দেখিল, একটি অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি বাক্সের নীচে আত্মগোপন করিয়া আছে। গুরু ভোজনের পর ইহা উপেক্ষা করিবার মত নয়!

চাউলের পয়সার তাগাদা করিতে আসিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রাঁধলেন আজ?

বগলা বলিল,—আমি তো এখানে খাইনি। এক বন্ধুর বাড়ীতে আজ নিমন্ত্রণ ছিল।

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—তা'হলে ভুরিভোজনই হয়েছে!

বগলা বলিল—হ্যাঁ!

মুখে অমায়িক হাসি ফুটাইয়া বিনোদ বলিল—ওহো আপনার পয়সা কটা; খুচরো পয়সা নাই ত এখন?

ভদ্রলোক বলিলেন,—রামচন্দ্র, সে যখন হবে দেবেন!

ভবঘুরে সঙ্ঘের সত্যই আজ সুপ্রভাত—

ঘন ঘন কড়ার শব্দে গাঢ় নিদ্রামগ্ন বগলার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অবসাদগ্রস্ত অলস মনটায় বিরক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, প্রত্যুষেই এমন শান্তিভঙ্গে সে ক্রুদ্ধ হইয়া দরজা খুলিয়া দিল।

আগন্তুক বগলার একজন পুরাতন বন্ধু। বলিলেন,—এই যে বগলা! তোর শরীর তো খারাপ হয়ে গেছে রে! কেমন আছিস্!

বগলা বলিল,—এখনও বেঁচে আছি।

বন্ধু বিজ্ঞ বৃদ্ধের মত উপদেশের সুরে বলিল,—ভাই, অযথা নিজের উপর অত্যাচার ক'রে কি হবে! বেঁচে থাকতে গেলে জীবনে দুঃখ-কষ্ট পেতেই হয়, বিয়ে ক'রে সংসার ক'রতে সুরু কর, দেখবি সব মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

বগলা হাসিয়া বলিল—আরে তুই কি সেই ছেলেবেলার প্রেমঘটিত দুর্ঘটনার কথা বলছিস্—ছিঃ ছিঃ, তুই আমাকে সত্যিই অপমান করলি! একটা মেয়ের পিছনে নিতান্ত হ্যাঙলার মত ঘুরে বেড়াতো যে বগলা সে বগলা এখন আর নেই,—বুঝলে? যাক্ তুই এখানে খাবি কি আজ?

—না ভাই, আমার বিশেষ কাজ আছে, সেবার তুই দু'টো টাকা ধার দিয়েছিলি, শোধ দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি, তাই—

বগলা হাত পাতিয়া দুইটি টাকা গ্রহণ করিল। বলিল—ইচ্ছে হ'লে সুদ আরও দু'টাকা দিয়ে যেতে পারিস্, আপত্তি নেই।

বন্ধু চলিয়া গেলে নিদ্রাগত বিনোদ ও বিপিনকে তুলিয়া, বগলা ঝন্ ঝন্ করিয়া টাকা দুইটি বাজাইয়া দিল। তন্দ্রাতুর কবি ও শিল্পীর চক্ষের কুয়াসা মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। চকিত চোখদুটি মেলিয়া দেখিল, সত্যই রৌপ্যমুদ্রা মেঝেয় শব্দায়মান।

বিপিন আগ্রহে আনন্দে বাজারে রওনা হইল, বহুদিন পরিতোষের সহিত আহার হয় নাই। তাই আজ ভুনি খিচুরী ও মাংসই হইবে। বিনোদ তৈলাক্ত ইলিশ মাছের কথা বলিয়াছিল, কিন্তু ভোটে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

দুপুরে পরিপূর্ণ পাকস্থলী ও প্রফুল্ল মন লইয়া বিনোদ তাহার ছবি-খানিতে শেষ রং সাজাইতে বসিল।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই ডাক-পিয়নের আগমন আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বগলার একখানি নাটিকা একটি ভ্যারাইটি শো হাউসে অভিনীত হইবার কথা ছিল। তাহারই মহলাতে উপস্থিত থাকিবার জন্য পত্র আসিয়াছে। অদ্যই পাঁচটায় উপস্থিত হইতে হইবে। বগলা দ্রুত ছেঁড়া পাঞ্জাবী সেলাই সুরু করিয়া দিল।

সকালে প্রাপ্ত দুইটি টাকার আট আনা ছিল, বগলা প্রস্তুত হইয়া বলিল,—চার আনা দাও, আর বাকী চার আনা তোমরা যা হয় খেও।

ভদ্রলোক চালের পয়সার তাগাদা করিতে আসিয়া বলিলেন—কোথায় যাবেন?

বগলা পকেট হইতে পয়সা দিয়া বলিল—একটু কাজে।

রাস্তায় নামিয়া দেখিল, গাছগুলির পাতা যেন আজ নূতন ফিকে-সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, বাতাসের ঝলকে ঝলকে পল্লব আন্দোলিত করিয়া নবদিবস যেন অভিবাদন করিতেছে। বগলা দ্রুতপদে চলিতে সুরু করিল—

শ্রান্ত বগলা চা পান করিবার জন্য একটি রেঁস্তোরাঁয় ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক বলিলেন, আসুন বগলাবাবু,—এই যে!

—নমস্কার—আপনাদের কাগজ কেমন চলচে!

—আর মশাই আপনাদের লেখা-টেকা আর পাই না, কি ক'রে ভালভাবে চলে?

—সাহিত্যিকদের পেট ব'লে একটা মারাত্মক জিনিষ আছে, এ কথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। নয় কি? আপনাদের আফিসে দশটা টাকা পাওনা ছিল, এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি, লেখার উৎসাহ প্রেরণা আসবে কোথা থেকে বলুন।

—হেঁ হেঁ, তা তো সত্যই, আচ্ছা চা খেয়ে চলুন, আফিসে টাকা আটকে রেখে লাভ তো কিছুই নেই।

বগলা বিনীতভাবে বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।—যথার্থ কথা।

আফিস হইতে দশটা টাকা পকেটে করিয়া বগলা সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—দেখুন বাজার বড্ড খারাপ, আর কিছু লেখা দেবেন, টাকাটা আর—

—হ্যাঁ তা দেব বই কি!

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে দেখিল, দশটি কাঁচা টাকা এবং খুচরা চারিটি পয়সায় পকেট ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

বগলা ষ্টেজের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পরিচয় পত্রে নাম লিখিয়া পাঠাইল, ম্যানেজার সাহেব নিজে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। ভিতরে প্রবেশ

করিয়া দেখে, একদল মেয়ে ষ্টেজের উপর নাচিবার কসরৎ করিতেছে। প্লেট হইতে একটি চুরুট ধরাইয়া বগলা তাহাতে মন দিল।

গৌরবর্ণা একটি মেয়েও তাহাদের সঙ্গে নাচিতেছিল। তরুণীর শ্লথ চরণমঞ্জীর মাঝে মাঝে তালভঙ্গ করিয়া, নৃত্যকে শ্রীহীন করিয়া দিতেছিল। ম্যানেজার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—পাঁচদিন পরে প্লে হবে, আর আজও পায়ের ষ্টেপ ঠিক হ'লো না!

তরুণীর নাম স্বরূপা। সে বলিল—আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে এসেছি বড়বাবু, তাই হ'চ্ছে না। কাল ত হ'য়েছিল—

স্বরূপা ক্লান্ত হইয়া বগলার পাশেই বসিয়া পড়িল।

তাহার নির্দ্দিষ্ট ভূমিকাও অভিনয় করিতে হইল। বগলা নেহাত না বলিলে নয় তাই দু'একটি ত্রুটি ধরিয়া দিল। মহলা একরূপ শেষ হইয়া আসিল। অন্যমনস্ক বগলা হঠাৎ এক সময়ে হাতের উপর একটি কোমল শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া চাহিয়া দেখিল, স্বরূপা ডাগর চোখ মেলিয়া তাহারই দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। স্বরূপা অতি মৃদুস্বরে বলিল—আপনার সঙ্গে টাকা আছে?

বগলা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নভাবে বলিল—কেন?

—সারাদিন কিছু খাইনি, সত্যিই বলছি কিচ্ছু খাইনি। কিছু দেবেন?……

মেয়েটি এমনভাবে হাত পাতিয়া চাহিয়া আছে যে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। বগলা বলিল—চলুন—খেয়ে, আপনাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে, আমি যাব, কি বলেন?

—ধন্যবাদ।

মহলা শেষ হইবার পর বগলা স্বরূপাকে লইয়া বাহির হইল। রাত্রি প্রায় এগারটা হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় লোকজন তেমন

নাই। পার্কও জনশূন্য। বগলা এবং স্বরূপা পার্কের একটা বেঞ্চে গিয়া বসিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ দুইজনেই মুখোমুখি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। জন-বিরল পার্ক যেন সেই নিঃশব্দতার মধ্যে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। তার পর খণ্ড খণ্ড কথা দিয়া দু'জনের সেই নিঃশব্দতার উপর পরিচয়ের সেতু গড়িয়া উঠিতে লাগিল। একটু আলাপের পরেই স্বরূপা তাহার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস বলিতে সুরু করিল—কোন এক অখ্যাত দূরদেশে খুব ছোট বয়সেই তার শুভ-বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তাহার পর অভাব, অনটন দুঃখ, দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া কয়েকটি বৎসর সেইখানেই কাটিয়া গেল। একদিন ঘনঘোর দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া সে একটি অবলম্বনের পিছন পিছন অজ্ঞাত পথে বাহির হইয়া পড়ে। কারণ খুব সরল এবং আধুনিক,বৃদ্ধ স্বামীর স্বামীত্ব সে পছন্দ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার পর সেই পুরাতন গল্প। বন্ধু তাহাকে কলিকাতায় কোন এক শ্রীহীন পল্লীতে বিসর্জ্জন দিয়া একদিন এই বিরাট সহরের জনারণ্যে হারাইয়া গেল। সে রহিল এক বাড়ীওয়ালীর হেফাজতে। উপার্জ্জনের উপরে বাড়ীওয়ালীর ট্যাক্স অত্যন্ত বেশী এবং তাহারই ফলে আজ খাওয়া জুটিয়া উঠে নাই। আদ্যন্ত সমস্ত বিবরণ নিবিষ্টমনে শুনিয়া বগলা বলিল—চলুন আপনাকে রেখে আসি।

স্বরূপা অন্ধকারের মধ্যে জড়ের মত নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে চোখের কোণ হইতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মুছিয়া বলিল—কোথায় যাব?

স্বরূপা আবার অনেকক্ষণ পরে যেন আপন মনেই বলিল—আপনি কি একটু আশ্রয় দিতে পারেন না?

বগলা খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল—আমরা থাকি একটা লিমিটেড

কোম্পানির মত ক'রে, এক ঘরে তিনজন—ব্যারাকে। সেখানে কি থাকা যাবে ?

মিনতির সুরে স্বরূপা বলিল—যাবে বগলাবাবু—

বগলা স্পষ্টই বুঝিল, এই মেয়েটি জীবনের সমস্ত অতীত ইতিহাস পিছনে ফেলিয়া, কেবলমাত্র কোনমতে-বাঁচিয়া-থাকিবার মত একটি অবলম্বনের জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। বগলা একটু দ্বিধা করিল, একটু কি বলিবে ভাবিল তাহার পর হঠাৎ বলিল—তবে চলুন।

ব্যারাকের নীচে তখনও তাড়ি খাইয়া মেথরেরা হল্লা করিতেছিল।

অন্ধকার সিঁড়ির পথে বগলা স্বরূপার হাত ধরিয়া তুলিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—বিনোদ, আমাদেরই মত নতুন আর একটি বন্ধু জুটেছে ভাই—এই দেখ।

বিপিন ও বিনোদ স্বরূপার লজ্জারুণ মুখখানার উপর অপ্রসন্ন কৌতুহলী দৃষ্টি হানিয়া কহিল,—তার মানে ?

বগলা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল—এর মাইনে তিরিশ টাকা, অতএব আমাদের দুশ্চিন্তার কোন হেতু নেই, বুঝ্‌লে ? বিপিন তোর মাদুরটা ছোট, ওটা ছেড়ে দে, তুই এখানে এসে শুয়ে পড়্।

বিপিন জড়পদার্থের মত গড়াইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। স্বরূপা বিনোদের মাদুরের প্রান্তে বসিয়া বলিল,—এ ছবি আপনি এঁকেছেন ? ছবিখানা কোন পাহাড়ী তরুণীর।

—হ্যাঁ, বলুন তো কেমন হয়েছে ?

স্বরূপা বলিল—বেশ।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া বগলা বলিল, —শিল্প চর্চ্চা পরে হবে। আজ শুয়ে পড়া যাক্। হ্যাঁ, আপনি ঐ মাদুরে শুয়ে পড়ুন। বালিশটা ময়লা, তা হোক, আপনার রুমালটা

দিয়ে ঢেকে নিন্। নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন—কাল সকালে যা হয় করা যাবে।

নবাগত অতিথির শয়নের পূর্ব্বেই বগলা তাহার নির্দ্দিষ্ট বিছানায় পড়িয়া নাসিকাধ্বনি সুরু করিয়া দিল। বিনোদ তুলিটা গামলায় ফেলিয়া দিয়া, পিছনে চাহিয়া দেখে, স্বরূপা ছবিটাকে অনিমেষ নয়নে দেখিতেছে। বিনোদ বলিল,—আপনি শুয়ে পড়ুন, আলো কমিয়ে দি। কাল ভাল ক'রে আলাপ ক'রে নেওয়া যাবে—আপনি রাঁধতে পারেন তো ?

স্বরূপা হাসিয়া জানাইল,—সে রাঁধিতে জানে।

বিনোদ উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল,—এই তো চমৎকার হবে। এতদিনে আমাদের লক্ষ্মীশ্রী হ'ল। বিপ্‌নেটা যা রাঁধে, খাওয়াই যায় না।

শঙ্কাকুল বিপিন চোখ বুজিয়াই পিট পিট করিয়া চাহিতেছিল। পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিল,—তোমার চেয়ে ভাল। আমার রান্নাটা তবু গেলা যায়।

ভবঘুরে সঙ্ঘের শয্যাত্যাগ করিবার কথা ছিল বেলা নয়টায়, কিন্তু আজ ছ'টায়ই ঘুম ভাঙিয়া গেল

বিনোদ সবিস্ময়ে দেখিল, শিয়রের চিরন্তন সর্ব্বরঙসমন্বিত কালো জলের গামলাটায় পরিষ্কার শাদা জল ; গামলাটাও পরিষ্কার, ষ্টোভটায় যে ময়লা সঞ্চিত হইয়া বর্ণ-বৈষম্য ঘটাইয়াছিল তাহাও নাই। প্যান্টারও সাবেক রঙ ফিরিয়া আসিয়াছে। ঘরের মেঝেয় যে সমস্ত দগ্ধ বিড়ির পরিত্যক্ত অংশ এবং দিয়াশলাইয়ের ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের মত কাঠি ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিত তাহাও নাই। বগলা বলিল—একদিনে এত পরিবর্ত্তন ক'রে দেওয়া ঠিক হয়নি, একটু আস্তে আস্তে ক'রলে হ'তো। অনভ্যস্ত চোখে লাগে—

স্বরূপা হাসিয়া কহিল—ঘুম থেকে উঠেছি দু'ঘণ্টা হ'ল, একটা কিছুতো ক'রতে হবে!

বিনোদ ষ্টোভ নাড়িয়া দেখিল, কিঞ্চিৎ তৈল তখনও আছে,—বলিল—ওহে বগলা! চা নিয়ে এস' না, আমাদের সার্ব্বজনীন গিন্নী কেমন চা তৈরি করেন দেখা যাক—

বগলা পকেট হইতে চারিটা টাকা ও খুচরা কিছু বাহির করিয়া বলিল—বিপিন, চা নিয়ে এস। আর বিনোদ, স্বরূপার একখানা কাপড় দরকার হবে, আর বাজারও ক'রে নিয়ে আসবে।

বিপিন চা আনিতে গেল। স্বরূপা অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—আমি চা তৈরি ক'রতে পারবো, কিন্তু ভাত রাঁধতে পারবো না।

পেয়ালার সন্ধান স্থগিত রাখিয়া বিনোদ বলিল,—তার কারণ? আপনাকে রোজ রাঁধতে হবে না, আমরাও রাঁধবো, এই ধরুন পালা ক'রে।

স্বরূপা দৃঢ়স্বরে বলিল—না।

বিনোদ বলিল, কেন?

—আপনারা কি?

—অকৃত্রিম মানুষ—যেমন তুমিও মানুষ।

—আমি ছোট জাতের মেয়ে।

বিনোদ হাসিয়া বলিল—তাতে কি? তোমার বিন্দুমাত্রও পাপ হবে না, বরং এই অভাগ্যদের সেবা ক'রলে পুণ্যই হবে। আমাদের কথা শোনো।

স্বরূপা হাসিয়া বলিল,—না।

বগলা বলিল,—না—কি? শোনো তোমাদের এই যে সংস্কার, এর কোন মানে হয় না। ব্রাহ্মণেরা সমস্ত সমাজের বুকে ব'সে রাজত্ব ক'রবে,

ও তারই ফন্দী। একটু চিন্তা ক'রলেই বুঝতে পারবে।—আচ্ছা গোবধ ক'রলে বামুনকে টাকা দিতে হবে কেন? এর কোন মানে হয়!

বিপিন চা লইয়া উপস্থিত হইলে মহাসমারোহে চা প্রস্তুত হইতে লাগিল। সমাজ ও ধর্ম্ম যে অশিক্ষিত লোকদের চিরদুঃখী করিয়া অভিজাতদিগকে সুখে বাস করিতে দেওয়ার একটি চমৎকার পন্থা, সে কথা বগলা সবিস্তারে এবং বহু যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বিনোদের এ সমস্ত জানা ছিল, বৃথা কালক্ষয় না করিয়া সে বাজারে রওনা হইল।

বগলার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইল বটে, কিন্তু স্বরূপা রাঁধিতে স্বীকৃত হইল না। ক্রুদ্ধ বগলা একখানা বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল,—উঃ অশিক্ষিত মনের সংস্কার কি কঠিন!

স্বরূপা হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, আমি রাঁধবো এখন—আপনারা যখন হুকুম ক'রেছেন!

বিপিন এতক্ষণ বেহালার ছড়ে রজন ঘষিতেছিল, কিন্তু বগলার ভয়ে বেহালা বাদন সুরু করে নাই। সেও হৃষ্ট মনে বাজাইতে আরম্ভ করিল। চাহিয়া দেখে, স্বরূপা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। বিপিন সতৃষ্ণ চোখে দেখিতে লাগিল।—স্বরূপার গালের উপরে গভীর টোল পড়িয়াছে, হাসিতে মধুর লজ্জা, কটাক্ষে মমতা জড়ানো।

স্বরূপা জিজ্ঞাসা করিল—আপনি লেখেন না?

বিপিন রসিকতা করিয়া বলিল—তা না হ'লে তেরস্পর্শ হয় কি ক'রে?

দুপুরে আহারের পর বগলা এবং বিপিন পুনরায় চাকুরির সন্ধানে রওনা হইবে। যাইবার পূর্ব্বে বগলা স্বরূপাকে বলিল,—তুমি বিকেলে কি ক'রে রিহার্সালে যাবে? একা যেতে পারবে?

স্বরূপা বলিল,—আমি আর সেখানে যেতে চাইনে।

—তোমাদের জাতটাই এমনি, পুরুষের কাঁধে ভর দিলেই নিশ্চিন্ত। চাকরিটী থাকবে কি ক'রে ?

—আপনি যাবেন ?

বগলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—আচ্ছা তু'জনে এক সঙ্গে যাব'খন, কাল থেকে এখানে গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রবো।

স্বরূপা মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলে, বগলা ও বিপিন রওনা হইল।

নির্জ্জন মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্য্যরশ্মির উত্তাপ ঘরখানির মধ্যে গুমোট হইয়া আছে। বিনোদ নিবিষ্টমনে ছবিখানার রং-এর প্রলেপ দিতেছে অসহ্য গরমে সমস্ত শরীর বাহিয়া ঘাম পড়িতেছে। স্বরূপা ভাঙা তালের পাখাটি লইয়া বাতাস করিতে বসিল। বিনোদ পাখাটি কাড়িয়া লইয়া বলিল—তুমি কষ্ট ক'রবে আর আমি বাতাস খাবো, এটা একেবারে অন্যায়—আচ্ছা স্বরূপা তোমার বয়স কত হ'ল ?

স্বরূপা হাসিয়া বলিল,—কেন ? পরে বলিল, একুশ কি বাইশ।

—তা' হলে এখনও জীবনের অনেক বাকী পড়ে, কি ক'রে সারাটা জীবন কাটাবে।

—এমনি ক'রেই—আচ্ছা আপনার বয়স ?

বিনোদ আঙুলে হিসাব করিয়া কহিল—আটাশ উনত্রিশ হবেই।

—বিয়ে করেন নি ?

বিনোদ হাসিয়া বলিল—করিনি নয়, হয়নি, হবে এমন ভরসাও নেই। তা ছাড়া আগ্রহও আমার বিশেষ নেই। আচ্ছা, এই যে আজ রান্না-বান্না ক'রলে, এত খাটলে এতে তোমার কষ্ট হয় নি ?

—না।

—মিথ্যে কথা, কষ্ট না হ'য়ে কি পারে ? যে জীবনের যা' অভ্যেস !

—ওটা আপনাদের ভুল। মেয়েদের ওতে বরং আনন্দ আছে—

বিনোদ বিজ্ঞের মত শির সঞ্চালন করিয়া কহিল—হুঁ, তা হ'তে পারে। ঝড় বৃষ্টিতে ভিজেও ত অনেক সময় আনন্দ পাওয়া যায়।

দুই জনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বিনোদ স্বরূপার অবনত সুশ্রী মুখখানার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। স্বরূপা চোখ তুলিয়া সহসা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—কি দেখছেন?

বিনোদ বলিল—চেয়ে ছিলাম তোমার মুখের দিকে সত্যি কিন্তু ভাবছিলাম আর একটি কথা।

—কি?

—আচ্ছা তুমি কোনদিন কাউকে ভালবাসনি?

স্বরূপা স্বাভাবিক লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। বিনোদ আবার বলিল,—লজ্জার বালাই যখন আমাদের নেই, তখন তোমার লজ্জাটা বিড়ম্বনাই হ'য়ে ওঠ্‌বে। আমাদের কিন্তু এসব জিজ্ঞাসা ক'রতে লজ্জা করে না।

স্বরূপা বিলোল আঁখিভঙ্গি করিয়া বলিল,—আপনার কথাই বলুন না। বিনোদ সোজা হইয়া ব'সিয়া বলিল,—মন সম্বন্ধে কোন নীতির ব্যাকরণই খাটে না, ভাল বেসেছিলাম বৈ কি! শুন্‌বে সে ঘটনা, আচ্ছা বলছি।

বিনোদ দরজাটা দিয়া, একটি বিড়ি ধরাইয়া বলিল—ওই বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করো, আমি ব'কে যাচ্ছি—

স্বরূপা তবুও বিনোদের পাশেই বসিয়া রহিল, বিনোদ তাহার কৈশোর প্রেমের অবান্তর দীর্ঘ ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা-ব্যাপী কৈশোর-প্রেম বর্ণনার শেষে বিনোদ যখন জীবনব্যাপী অখণ্ড বিরহের কথা বলিতে লাগিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বর দুঃখে ক্ষোভে উত্তেজনায় জড়াইয়া আসিয়াছে। অবশেষে বলিল—ভাই, সেই অবধি

কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারিনে যে, মেয়েরা ভালবাসতে পারে। তারপরে আর একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল, তাকে সম্পূর্ণভাবে পেয়েছিলামও, কিন্তু আজো সেই না-পাওয়ার দুঃখটাই নিরন্তর বুকের মাঝে কাঁটার মত খচ্ খচ্ ক'রে বেড়ায়, এর কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু কিন্তু খুঁজে পাইনি।

স্বরূপা বলিল,—ওর কোন হেতু নেই, ওটা স্বাভাবিক। তবে নিতান্তই একটা ভুল কথা শিখে রেখেছেন, মেয়েরাও ঠিক আপনাদের মত ভাল-বাসতে পারে, তবে তাদের বাধা বন্ধন অনেক বেশী।

বিনোদ নির্লিপ্তের মত পাশ ফিরিয়া বলিল—যাক্‌গে একটু ঘুমুই, তুমিও একটু শুয়ে নাও।

বিনোদ অনেকক্ষণ দেয়ালের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটি ক্ষুধিত টিকটিকির শিকার সন্ধান দেখিল, ফিরিয়া তাকাইতেই দেখে স্বরূপা তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অকারণে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

বিনোদ হাসিয়া বলিল,—আমার পিঠ যে এত সুন্দর, তাতো জানতুম না।

বিকালে বগলা ও বিপিন বিজয়োল্লাসে ফিরিয়া আসিল। বগলা পাইয়াছে একটি মাসিক পত্রে সহঃসম্পাদকের পদ,—কাজ, সকাল দশটা হইতে বৈকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত, প্রুফ দেখা হইতে সুরু করিয়া, সম্পাদকীয় লেখা; এমন কি,স্বত্বাধিকারীর অবোধ শিশুটির সিগারেটের ছবির যোগাড় করিয়া দেওয়াও। বেতন আপাততঃ পঁচিশ টাকা, কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে বেতন বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা। বিপিন পাইয়াছে, একটি

প্রাইভেট টিউসনি, তিনটি ছেলেকে দুইবেলা পড়াইতে হইবে, বেতন মাসিক আট টাকা। অধিকন্তু নিত্য বৈকালে চা এবং তৎসহ দুইখানি বিস্কুটেরও আশা আছে।

বিনোদ আনন্দে আত্মহারা হইয়া বন্ধুদের আলিঙ্গন করিল: কিন্তু স্বরূপা এই শ্রীহীন অসম্মানকর চাকুরী পাওয়ায় খুব বেশী আনন্দিত হইতে পারিল না, তাই চুপ করিয়া রহিল।

বগলা বলিল—আর আমাদের ভাবনা রইল কি? পঁচিশ আর আট তেত্রিশ, আর তিরিশ, তেষট্টি টাকা মাসিক আয়, বাঁধা। আর না খেয়ে থাকতে হবে না।

বিপিন মাথা নাড়িয়া বলিল, এমন কি মাসে মাসে মাংস পোলাও হ'তে পারবে, তা ছাড়া মাসে একটা ক'রে গোটা পাঞ্জাবী তৈরী করা যাবে, আর বায়স্কোপ সপ্তাহে একদিন।

বিনোদ বলিল,—হবেই ত, কেন হবেনা, ধর—

সে সাংসারিক লোক, কাগজে-কলমে হিসাব করিয়া বাজেটে দেখাইয়া দিল যে, এরূপ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এমন কি চার টাকা নয় আনা সাড়ে সাত পাই মাসিক সঞ্চয়ও হইতে পারে।

বগলা পরদিন সকালে সাড়ে আটটায় ঘুম হইতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিল। স্বরূপা বলিল—ওদের ঘুম কি গাঢ়! অত ডাকতে হয়!

বিনোদ তন্দ্রালস আঁখি বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ডাকাত এসে থাকে তো চাবি দিয়ে দাও, আমাকে ডেকো না—

বগলা বলিল,—ওই একটা আশীর্ব্বাদ আমাদের আছে, চোর এসে একেবারে বেকুব হ'য়ে ফিরে যাবে।

বিপিন একটি স্বরচিত সঙ্গীতের প্রথম ছত্র গাহিয়া উঠিল—আমি স্বপনে শিয়রে পেয়েছিনু তারে, হারায়ে ফেলেছি জাগিয়া।

—কি হ'লো কবি?

বিপিন আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—যে স্বপ্নটি দেখেছিলুম এমনি স্বপ্ন যদি সারাটি জীবন ভ'রে দেখ্‌তে পেতুম!

—কি?

বিপিন বলিল,—দেখলুম, এক পল্লীর নিভৃত কোণে একটি বাড়ী। অপরিসর উঠানের কোণে কচি শশা ঝুলছে। পরিষ্কার উঠান, আশে-পাশে দুটো মরসুমী ফুলের গাছ, তারই পাশ দিয়ে যেন একটি ছোট্ট কিশোরী বৌ আমাকে দেখে ঘোমটা টেনে দিচ্ছে। পিছনে দাঁড়িয়ে মা হাসছেন। ব'ললেন, আমাদের বৌমা বেশ একটু দুষ্টু। আমার বুকখানা গর্ব্বে ভ'রে উঠ্‌লো! তারপর আমাদের গাঁয়ের সেই বিস্তৃত বিল। তার মাঝে নালের পাপড়ী-ঝরা পরাগ জ্যোৎস্নায় ভেসে বেড়াচ্ছে—এক নৌকায় আমি আর সেই·········ঘুম ভেঙে গেল।

রসিকতা করিবার মত প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না। গত জীবনের কতকগুলি এলোমেলো স্মৃতি চারিদিক হইতে ক্রমাগত ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। সেই অতীত, সেই বুড়ো বটতলা, সেই কুল চুরি, সে ত ঠিক এরই মত নিছক স্বপ্নই!

স্বরূপার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। মানুষের জীবনে এমনও ত হয়, কিন্তু এদের কাছে ইহা শুধু স্বপ্ন!

বগলা এই বেদনার্ত্ত চিন্তাধারার মধ্যে জোর করিয়াই একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দিবার উদ্দেশ্যে কহিল,—আমার পকেটে কিছু নেই, যদি কিছু থাকে ত দাও, আফিসে যেতে হবে।

একুনে নয়টি পকেট খুঁজিয়া তিনটি পয়সা এবং দুইটি আধ পয়সা

মিলিল। কর্ম্মঠ বিনোদ চাল কিনিয়া আনিয়া বলিল,—ফেনে-ভাতে রেঁধে নাও স্বরূপা, নুন আছে তো ?

স্বরূপা খুঁজিয়া দেখিল, ষ্টীলের বাটিটার প্রান্তে একটু নুন আছে! অবিলম্বে ভাতও হইয়া গেল কিন্তু ষ্টোভের তৈলাভাব বশতঃ ভাল সিদ্ধ হইল না।

বগলা খাইতে খাইতে বলিল,—স্বরূপা তুমিও সেরে নাও এখন, দেখি তোমার···ওকি তোমার জন্য রাখো নি ? না—না—

বগলা স্বরূপার জন্য সমান ভাত রাখিয়া আফিসের তাড়ায় গো-গ্রাসে খাইতে খাইতে কহিল,—ভাত সিদ্ধ যেমন হয়নি, সেটা ভালই হ'য়েছে, এতে ভিটামিন বেশী থাকে। সে হাসিয়া খাইয়া লইতে লাগিল। বিনোদ বলিল—একটা ভাল গল্প শোনো, খাওয়ার কষ্ট ধরা যাবে না।—কেবল শুধু ভাত!

তিন বন্ধুর মুখ অবিকৃত অম্লান। এই দুঃখ দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে এদের কোন প্রতিবাদ নাই। স্বরূপার চোখ দু'টি ভিজিয়া উঠিল।—ওরা এমন করিয়াই বাঁচিয়া আছে! বাঁচিয়া থাকিবার এদের কি প্রয়োজন ? সে আর ভাবিতে পারিল না, কুয়াশায় চোখের দৃষ্টি যেন সহসা ঝাপ্সা হইয়া আসিল।

বগলা বলিল,—ওকি স্বরূপা তুমি কাঁদ্‌ছো! একি আবার একটা দুঃখ নাকি! তুমি কিচ্ছু ভেব না। চিরটা কাল আর এমনি যাবে না। আমাদের হামেসাই এমন হয় কিনা তাই এতে আর দুঃখ হয় না।

বিনোদ ও বগলা অফিসে বাহির হইল। মাসিক পত্রিকার অফিসে বিনোদের ছবিগুলির সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সুবিবেচনার ফলাফল জানিবার দরকার ছিল

বিপিন আর স্বরূপা নির্জ্জন দুপুরে অজস্র অপ্রাসঙ্গিক কথার জাল বুনিতে বুনিতে কাটাইয়া দিল। অবশেষে কাজের অভাবে বিপিন একটা বালিশের উপর বসিয়া পুরাতন জীর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলি একত্রিত করিতে লাগিল।

স্বরূপা বলিল,—বালিশ থেকে নেমে বসুন, বালিশ ফেঁসে গেল যে!

বিপিন গম্ভীরভাবে বলিল,—বাঃ, তোমার শাসন কি মিষ্টি!

—তাই ব'লে ওখানে ব'সতে পাবেন না, ওটা ছিঁড়লে যে আবার হবে, এমন আশা নেই, শেষে একখানা ছেঁড়া বই মাথায় দিয়ে শুতে হবে।

বিপিন বলিল—তোমাদের জাতটাই যে স্বল্পবুদ্ধি! যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, জানো তো? যদি ছেঁড়া বই মাথায় দিতে হয়—দেব, কিন্তু এখন তো ব'সে আরাম হ'চ্ছে।

স্বরূপা বালিশ কাড়িয়া লইয়া বলিল,—ওগুলো কি হ'চ্ছে? কি হবে ও দিয়ে?

বিপিন পাণ্ডুলিপি আর একবার উল্টাইয়া বলিল,—লাগবে—মরার পরে, যদি নেহাত কাঠের অভাব হয়। তার আগে ডাষ্টবিনে ফেল্‌তে পারবো না।

—আচ্ছা থাক্, আমি গুছিয়ে দেব। আপনি একটু ঘুমোন। বিপিন এক দৃষ্টিতে স্বরূপার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেক হাসি, অর্থহীন কথায় দ্বিপ্রহরের নির্জ্জন মুহূর্ত্তগুলি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিপিন সহসা প্রশ্ন করিল,—তুমি কাউকে ভালবাসোনি?

এই একই প্রশ্ন বিনোদ সেদিন করিয়াছিল কিন্তু কোন উত্তর দেওয়া হইয়া উঠে নাই। তাই বলিল,—ঠিক বুঝতে পারিনে, যেখানে বিয়ে হ'য়েছিল সেখানে আনন্দ পাইনি। কারাগার ব'লে মনে হ'য়েছে, তাই বেরিয়ে পড়েছি। যখন অর্থের জন্য প্রেমের অভিনয় ক'রেছি, তখন কারও

জন্য এতটুকু বেদনা বা আগ্রহ অনুভব করিনি, তখন মানুষের চেয়ে তার পকেটের উপরই দরদ ছিল বেশী। কিন্তু আপনাদের এই ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবন দেখে সত্যিই চোখে জল আসে।

বিপিন সগর্ব্বে বলিল,—তা হ'লে আমাকে ভালবেসেছ বল!

স্বরূপা স্নেহ-সিক্ত একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল,—আপনাদের কথার কি কোন মাথা মুণ্ডু নেই!

—ওটা নেই তাই বেঁচে আছি স্বরূপা, কিন্তু আমরা ভালবাসা শব্দটার একটু কদর্থ ক'রেছি সেটা জান তো?

স্বরূপা মাথার কাপড়টা টানিয়া, মুখ ফিরাইয়া অভিমানের সুরে বলিল, —যান্, আপনি একেবারে বেহায়া।

—সেটা তো ভূমিকাতেই ব'লেছি, কিন্তু আমার একার উপর করুণা-দৃষ্টি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ ক'রো না, ও বন্ধু দুটিও ঠিক আমারই মত বালির বস্তা; জলেও ভেজেনা, রোদেও পোড়ে না।

স্বরূপা বলিল—আমি তো শুনছি সার্ব্বজনীন গিন্নি, তবে আবার ওকথা কেন?

সামনের বড় বাড়ীটার সুউচ্চ চূড়ার আড়ালে তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। তাহারই খানিকটা রঙীন আলো বুঝি স্বরূপার ছোট কপালটির উপর, এলোমেলো চুলগুলির উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

স্বরূপা বলিল,—দেখুন আকাশের কোণটা কি চমৎকার হ'য়েছে—যেন আলোর ঢেউ!

বিপিন স্বরূপার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাহিল সেইদিকে। স্বরূপা অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, —ছেলে পড়াতে যাবেন না?

—হ্যাঁ, দু'খানা বিস্কুটের আশা আছে।

বিপিন জীর্ণ বোতামহীন পাঞ্জাবীটা একবার ঝাড়িয়া লইল, তারপর একটি পেপার-পিনের সাহায্যে গলাটা আটকাইয়া লইয়া পড়াইতে বাহির হইল। স্বরূপার রিহার্সাল নাই, সে তার গত জীবনের স্মৃতির সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল।

তাদের গ্রামের, সেই পথ—তাহার দুই ধারে কেয়াবন। সুগন্ধ পুষ্প-পরাগ বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইত। মরা-নদীর চরে খঞ্জন খঞ্জনী পুচ্ছ নাচাইয়া ফিরিত,—শৈবালদল ভেদ করিয়া কলমীলতা নদীর মাঝে চলিয়া গিয়াছে, লিক্‌-লিকে ডগা, তাহার মাথায় গোলাপী দুই একটি ফুল। অমনি করিয়াই তাহার দেহের কৈশোর কোরক একদিন বর্ণে গন্ধে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গরীব গৃহস্থের একখানা ছোট ঘর, ছোট্ট একটু প্রাঙ্গণ, সুরভী গাভী, তুলু পাতিহাঁস—এই সব নিয়ে ভরা তার কৈশোর।

তারপর একদিন শ্রাবণের বর্ষণ-শ্রান্ত রাত্রে এক ঢোল এক কাঁসির বেতাল বাজনার মাঝে জীবনের নব যাত্রারম্ভ—সহযাত্রী একটি বৃদ্ধ······ শ্বশুরবাড়ীর সেই রুদ্ধ কারাগার, আর সেই কারাগারের প্রাচীর ভাঙিয়া প্রতিনিয়ত অবাধ্য মনের, গাঙের তীরে সেই বকুলতলায় মালা গাঁথিতে ছুটিবার অভিসার।. জীবনের সে এক বন্ধুর দীর্ঘ ক্লান্ত পথ!

দুদিনের দুইটি দিশেহারা ঢেউ, তাহার পরে গাঢ় অন্ধকার রাত্রি, মহা-দুর্য্যোগ ক্লান্ত ভারবাহী পশুর মত অবাধ্য দেহ অত্যাচারে জীর্ণ হইয়া যাইত। এই অভাগাদিগের সহিত দেখা, কিন্তু এরা বড় দুঃখী, অন্তরে মনুষ্যত্বের চীৎকারের টুঁটি টিপিয়া, ইহাদের ক্ষুধিত শৃগালের মত উঞ্ছবৃত্তি,—শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য। তবু এই বিচিত্র বন্ধুত্বের জন্য সে মনে মনে বিধাতাকে প্রণাম করিল।

তুলসী ও গঙ্গাজলে ক্লেদাক্ত মাটি হয় পুণ্য বেদী—কিন্তু তার সর্ব্বাঙ্গের এই ক্লেদকে মানুষ বোধ করি সহজে মুছিয়া ফেলিতে দিবে না।

বগলা অফিস হইতে ফিরিয়া ক্লান্তদেহে শয্যায় পড়িয়া বলিল,—স্বরূপা আজ বুঝি কিছু খাওয়া হবে না,—না ?

বগলার শ্রান্ত ম্লান মুখখানিতে হতাশার অভিব্যক্তি। স্বরূপা নীরবে বসিয়া রহিল,—তাহার কণ্ঠে এ প্রশ্নের উত্তর নাই।

—আফিসে যা খাটুনি। এক মুহূর্ত্ত অবসর নেই, একটা বিড়ি চেয়ে নিলুম কিন্তু খাবার অবসর নেই, স্বরূপা আর্ট মানুষের এত প্রিয়, কিন্তু শিল্পীর ক্ষুধার দাম কেউ দিল না !

স্বরূপা বলিল,—বিনোদবাবু সেদিন ব'লেছিলেন, প্রেসের চাপে পড়ে আর্ট থেতিয়ে যায় কিনা,—তাই।

বগলা বলিল—সারা বাংলার দিকে চেয়ে দেখলে সত্যিই দেখা যাবে, অতি সাধারণ বইয়ের বিক্রি সব চেয়ে বেশী, কিন্তু যা সাধারণের উপরে তাকে কেউ বুঝতে চায় না।

বিপিন ও বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনোদ বলিল,—বগলা, খাবার আজ চমৎকার ফন্দী হয়েছে—গোয়াবাগানের একটা বাড়ীতে দেখলুম শ্রাদ্ধ হ'চ্ছে, খুব ভীড়, চল সবাই ঢুকে পড়ি—কুকুরের মত তাড়িয়ে আর দেবে না।

বগলা সোৎসাহে বলিল,—চল্, আর দেরী নয়, শুভস্য শীঘ্রং। স্বরূপা, ঘুমোও, খাবার আমরা নিয়ে আসবো।

তিনবন্ধু দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

শ্রাদ্ধবাড়ীতে ব্যয়-বাহুল্য ও মানুষের অভাব নেই। আড়ম্বর ও বাহুল্য ব্যয়ই আভিজাত্য—অতএব গৃহস্থ অভিজাত।

একটি নেড়ামাথা ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনারা ?

বগলা হাসিয়া বলিল,—মানুষ।

—আজ্ঞে সে তো সত্যি,—কিন্তু কোথা থেকে ?

—কলকাতা থেকে ?—

—ও—তা—

বগলা ব্যাখ্যা করিবার ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া বলিল,—আহূত অনাহূত বা রবাহূত এই তো প্রশ্ন ? তা আহূত হ'লে আপনারা ভদ্রতা করতে বাধ্য, অনাহূত বা রবাহূত হ'লে কাঙালী-ভোজের দলেই দিতে হবে—

—ছিঃ ছিঃ—আমি সে কথা বলিনি, আপনাকে চিন্‌তে পারিনি তাই—আসুন—আসুন—

—চলুন—

বাসায় ফিরিয়া তাহারা চুরি করা মিষ্টান্ন এবং লুচি পকেট হইতে বাহির করিয়া স্বরূপার সম্মুখে ধরিল। স্বরূপার সমস্ত অন্তর ক্রোধের উত্তাপে তিক্ত হইয়াই ছিল। এই নির্লজ্জ আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জনের অভিমান লেলিহান শিখার মত তাহার হৃদয়ে অস্থিপঞ্জরে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ! স্বরূপা মিষ্টান্নগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া বলিল,—আমি খাব না,—আপনারা কেন অমনক'রে বেঁচে আছেন, না খেয়ে মরে যেতে পারেন নি ?

বগলা উন্মাদের মত এক চোট হাসিয়া লইয়া বলিল,—মেলোড্রামা হ'লে তুমি ক্লাপ পেতে স্বরূপা। কিন্তু ওর চেয়ে খুব সংক্ষেপে মরবার ওষুধ আমি জানি, একটু পোটাসিয়াম সাইনাইড, কিন্তু তার দরকার তো হয়নি। তুমি আসবার পর এমন বিশেষ কষ্ট কিছু হয়নি। মরতে অনেকবার চেয়েছি, কিন্তু এই শ্যামল সুন্দর পৃথিবীকে ফেলে যেতে ইচ্ছা হয় না।

স্বরূপার দুই চোখে তখন অশ্রুধারা নামিয়া আসিয়াছে। কোনমতে সে বলিতে পারিল—আপনারা অমন ক'রে ভিক্ষে ক'রবেন না বগলাবাবু—আমি পারবো না সহ্য ক'রতে—

বগলা আর একবার হাসিয়া বলিল—ভিক্ষে তো করিনি, কৌশলে চুরি ক'রেছি মাত্র······ওতে কাঁদবার কিচ্ছু নেই। এস আমার কাছে ব'সে গল্প কর, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমোই—

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া স্বরূপা সেদিন বগলাকে বাতাস করিয়াছিল। তার চোখের প্রান্ত বাহিয়া সে রাত্রে যদি ফোঁটা ফোঁটা জলই ঝরিয়া থাকে, পরিশ্রান্ত বগলার পক্ষে তার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

পরদিন নয়টায় বগলা অনাহারেই আফিসে রওনা হইয়া গেল। এমন অনাহার স্বল্পাহার তাহার জীবনে অনেক ঘটিয়াছে, কিন্তু আজ এই দুঃখ যেন নিরন্তর দংশন করিতে লাগিল।

শ্রাবণের বৃষ্টির মত একটু বৃষ্টি হইয়া গেল।

বগলা গাড়ী-বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল বাড়ীটার মেজে শ্বেত পাথরের,—না জানি সে জন্য কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু এই গাড়ী-বারান্দার বেশ আবশ্যকতা আছে। বেশ দাঁড়ানো যায়। এই লোকগুলি কেমন? তারা কি খায়! তাদের জীবন যাত্রা কেমন?

বৃষ্টি একটু থামিতে সে অফিসের তাড়ায় রওনা হইল। একটি মোটর গায়ে কাদা-জল ছিটাইয়া দিয়া গেল। মোটরের মাঝে একটা তম্বী-তরুণী ছাত্রী, সারাদেহের লাবণ্য জ্যোৎস্নাধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে, নিটোল স্বাস্থ্য, পরিপূর্ণতার শ্রী। কে জানে—কত দামের একখানা উজ্জ্বল শাড়ী, গোলাপী ললিত গালটির উপর বহুমূল্য কর্ণকুণ্ডল!

পানের দোকানের আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া বগলা দেখে, দাড়িগুলি তার খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে; কয়েকদিন কামানো হয় নাই!

দোতলায় অফিস। নীচে অবিশ্রান্ত প্রেসের শব্দ একটানা চলিয়াছে। সম্মুখে রাস্তার ওপারে একটা রেস্তোরাঁ। কত লোক পূর্ণোদরে সিগারেট মুখে দিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। বগলা কলম ফেলিয়া দেখিতে লাগিল—সবটা দেখা যায় না। তবুও, তাহার মাঝে ব্যস্ত বেয়ারার হাতে খাদ্যপূর্ণ প্লেট বেশ স্পষ্ট আসিয়া চোখে লাগে। কত রকমের খাবার, কত বিচিত্র স্বাদের!

বগলা জানালা বন্ধ করিয়া দিল। এই স্বাভাবিক দৃশ্যটাই যেন আজ তাহাকে প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করিতেছে!

সহকর্ম্মী বলিলেন,—জানালা বন্ধ ক'রে দিলে সাফোকেশন্ হবে যে!

বগলার তর্ক করিবার প্রবৃত্তি ছিল না, সে জানালাটার দিকে পিঠ দিয়া প্রুফ্ দেখিতে লাগিল; দেখা প্রুফে আজ অসংখ্য ভুল রহিয়া গিয়াছে। তা থাক।

সারাদিন পরে ক্লান্ত দেহে বগলা অফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সহকর্ম্মীর নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ একটা বিড়ি ছিল, ধরাইয়া লইয়া মাঠের দিকে চলিতে সুরু করিল। বিস্তৃত মাঠ, কত লোকের আনাগোনা। জমায়েৎ বন্ধুমহলে উচ্চ হাসির প্রস্ফুট শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। ঘাসের আস্তরণের উপর সে বসিয়া পড়িল।

অতীতের স্মৃতির মধ্যে যতদূর দেখা যায়, তার সবটুকুই ধূসর মাঠের মত ধু ধু করিতেছে!

সেই বাড়ীটা! মা'র মুখে শুনিয়াছে তাহারই শ্যামল উঠানের কোণে সে একদিন লাঠি ঘাড়ে করিয়া মাতালের মত টলিয়া টলিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে। সেই ভিটাখানি! তাহার উপর হয়ত আজ ভেরাণ্ডার ঝাড়

বড় গাছ হইয়াছে, কত আগাছা জন্মিয়াছে, নয় তো যে মহাজনের কাছে মাতার শ্রাদ্ধের জন্ম রেহান আছে, সে আসিয়া বিরাট প্রাসাদের পত্তন করিয়াছে···

যাক্—

মাঠের ধারে সানপুকুরের পত্রসমাকুল বৃদ্ধ বটগাছের তলায় বসিয়া জীবন-বোধনের সুখ-স্বপ্ন যেন একটা ব্যঙ্গ! বাঁচিয়া যদি থাকিতেই হয় মানুষের মত থাকিব,—অস্বচ্ছল গৃহস্থালী, রুগ্না একটা স্ত্রী, অপোগণ্ড শিশু অনাহারে কৃশ, এ জীবন চিন্তারও অতীত। সেই স্কুলে যাওয়া, দীর্ঘ পথ আসা-যাওয়া, ক্ষুধাতুর বালকের ক্লান্ত পদক্ষেপ···

জীবন আজও তেমনি চলিয়াছে—না-চলারই অনুরূপ। বগলা ক্লান্ত অবসন্ন পা দু'টিতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক অন্ধকার, তাহার মধ্যে উজ্জ্বল বিজলী বাতির মালা। সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। বগলা পড়িয়া যাইতেছিল, পাশের লাইট-পোষ্ট জড়াইয়া ধরিল।

রাত্রি নয়টায় সংকীর্ণ গলির সারি অতিক্রম করিয়া বাড়ী ফিরিল। দরজায় ধাক্কা দিয়া যাহা দেখিল তাহার আনন্দে বগলার সমস্ত দুঃখবাদ উবিয়া গেল। ষ্টোভের উপর মাংস রান্না হইতেছে, তাহারই সুবাস বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মেঝের উপর একখানি জরিদার কাপড়।

স্বরূপা আজ মাহিনা পাইয়াছে। বিনোদ বাজার করিয়া দিয়া গিয়াছে। স্বরূপা নিবিষ্ট মনে রাঁধিতেছে।

স্বরূপা বলিল,—আপনার ক্ষিদে পেয়েচে, বসুন। মাছ দিয়ে খেতে খেতে মাংস নামবে। আর ওই পাতায় সন্দেশ আছে, আমরা সকলেই একবার খেয়েছিলাম কিনা।

বগলা গোগ্রাসে সন্দেশটুকু গিলিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিক জল খাইয়া বলিল—বাঁচলুম।

নীরবেই কিছুক্ষণ গেল।

স্বরূপা সহসা বলিল—এমন ক'রে বেঁচে থাকার আমি কিন্তু কোন সার্থকতা পাই নে।

বগলা বলিল, আমরাও পাই এমন নয়। মার শ্রাদ্ধ ক'রে একবার চারপাশে চেয়ে দেখলুম, সেখানে বেঁচে থাকবার মত কোন অবলম্বন নেই। ম'রে যেতে ভয় হয়নি সত্যি কিন্তু ইচ্ছা হয়নি। দুনিয়ার এত লোক বেঁচে আছে আর আমরা কেন ম'রে যাব? বেঁচে থাকতে হয় তো মানুষের মত থাকবো এই ছিল ইচ্ছা, কিন্তু আমাদের মানুষ হবার আগেই বেঁচে থাকা শেষ হ'য়ে যাবে জানি। তুমি নতুন ক'রে ভাবছো তাই অতটা ব্যথা পাও, আমরাও একদিন পেতাম। কিন্তু একই দুঃখের জন্য নিত্যই ক্ষোভ প্রকাশ করা চলে না।

জরিদার কাপড়খানা ভাল করিয়া দেখিয়া বগলা বলিল—এ তোমার?

—হ্যাঁ, একখানা ভাল কাপড় না হ'লে বেরোনোই যায় না, সবাই ঠাট্টা করে।

বগলা একটী গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভালই ক'রেছ।

স্বরূপার জরিদার কাপড় দেখিয়া আজ তাহার মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই, শুধু মনে হইয়াছে, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এইটুকুর একান্তই প্রয়োজন। আর স্বরূপার জন্য এটুকু দেওয়াও তাহার পক্ষে খুবই সোজা।

তিনটি দীর্ঘ মাস দুঃখ-দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া কোনমতে চলিয়া গিয়াছে।

বিপিন হঠকারিতায় একটা মস্ত ভুল করিয়া ফেলিয়াছে—

ছাত্রের বাড়ীতে চা ও বিস্কুটের অসদ্ভাব সে অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পড়াইবার উৎসাহও অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। একটা দৈহিক ক্লান্তিও ত আছে! ছাত্র যখন আন্‌মনে পাড়িয়া যাইত, তখন বিপিনের মনে পড়িত তাহার বুকখানা যেন একটা খরস্রোতা নদীর ভাঙন, তাহার গায়ে আজ যেন আবার কল-কল্লোল নিয়ত প্রহত হইয়া কলতান করিতেছে,—সে বসিয়া বসিয়া কবিতা লিখিত।

ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—স্যর চুণকামের ইংরাজি কি?

বিপিনের মনটা তখন একটা মিলের সন্ধানে শিকার-লোলুপ ব্যাঘ্রের দৃষ্টির মত তীক্ষ্ণভাবে ছুটিয়াছে। বলিল,—হুঁ।

ছাত্র বলিল,—চুণের ইংরাজি ত লাইম, কামের ইংরাজি ওয়ার্ক তাহলে কি লাইম-ওয়ার্ক হবে মাষ্টার-মশাই?

বিপিন তখন তাণ্ডবের সহিত রাসভের মিল খুঁজিয়া পাইয়াছে কিন্তু পছন্দসই হয় নাই। বলিল—হুঁ।

ছাত্রের পিতা আহ্নিক করিতে করিতে পড়ানো শুনিতেছিলেন। বলিলেন,—কি হ'লো মাষ্টার? চুণকামের ইংরাজি লাইম-ওয়ার্ক? কেবল ফাঁকি দিয়ে টাকাগুলো নেওয়া হচ্ছে? ব্যাগার, না?

বিপিন কথাটা উপলব্ধি করিল। আট টাকা মাহিনা ও চা বিস্কুটের অসদ্ভাবের জন্য তাহার মনে প্রচুর ক্ষোভ সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাই বলিল,—আট টাকায় লাইম ওয়ার্ক পর্য্যন্তই হয়, ওকে হোয়াইট ক'রতে পনর বিশ টাকা লাগে—

অভিভাবক ক্রুদ্ধ হইয়া বিপিনকে জবাব দিলেন।

বিপিন অসমাপ্ত কবিতার কাগজটা পকেটে ফেলিয়া বলিল,—আচ্ছা নমস্কার! তাহ'লে বাকী মাইনের জন্য কবে আসবো?

—আবার মাইনে! আপনার নামে চিটিং-কেস ফাইল ক'রবো।

বিপিন হাসিয়া বলিল,—তাহ'লে শুধুই নমস্কার—

বিপিন রাস্তায় আসিয়া দেখিল, সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গলির বাতসটুকু বদ্ধ নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে অক্সিজেন যেন নাই, দম বন্ধ হইয়া আসে।

তিন চারদিন পরে বিপিন তাহার বেহালাখানা বাঁধিতে গিয়া দেখে তাহাতে প্রচুর ধূলা জমিয়াছে। কান ধরিয়া মোচড় দিতেই একটা তাঁত কাটিয়া গেল। বিপিনের কাজ ছিল না, সে ভাঙা বেহালাই বাজাইতে সুরু করিল।

বেলা প্রায় আটটায় বগলা ঘুম হইতে উঠিয়া বলিল, কি একঘেয়ে বাজিয়েই চ'লেছিস! ঘুম ভেঙে গেল যে!

কবি বিপিন উদাস কণ্ঠে বলিল,—অমন কত যায়। তার জন্য অনুশোচনা বৃথা।

শিল্পী বিনোদ চোখ দুটি রগড়াইয়া বলিল,—শুধু বেহালা একেবারে অশ্রাব্য,—স্বরূপা, একটা গান কর না!

স্বরূপা হাসিয়া বলিল—বেশ, এখন এখানে একটা রমণী-কণ্ঠ শুনলে মানুষে মনে ক'রবে কি?

কবি বলিল—বলবে, বাঃ বেশ গান হ'চ্ছে তো!

স্বরূপা বলিল—একেই তো সুনামের অন্ত নেই আপনাদের, তার পরে—

বগলা বলিল,—কেন? রাস্তায় যেতে যেতে শুনি কত ভদ্রলোকের বাড়ীতে গান হচ্ছে।

—ওই ভদ্রলোকের বাড়ী না হ'লে গান করা নিষিদ্ধ।

স্বরূপা তরকারি কুটিতে মনোযোগ দিল।

বিপিনের বেহালা বাজান হইল না। সে ক্ষুণ্ণমনে তরকারী-কোটা

দেখিতে আরম্ভ করিল। বিনোদ তুলিটায় লাল রং লইয়া মেঘের গায়ে দিতে লাগিল।

স্বরূপা বলিল,—বাজার করতে যাবেন না?

বগলা গতকাল মাহিনা পাইয়াছিল, বাইশ টাকা দশ আনা। কয়েক-দিন লেট হইবার জন্য বাকীটা কাটা গিয়াছে।

বিপিনের কাজ ছিল না, সে বাজারে রওনা হইল।

এমনি করিয়া ক্ষুদ্র এই ভবঘুরে-সংসারের অস্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা পিছল পথে পা টিপিয়া টিপিয়া আরও দুই চারিদিন চলিল, কাহারও মনে নীতির বালাই নাই। স্বরূপার তিনটি বন্ধু, তিনটি বন্ধুর মতই তাহার মনের কোণে একটু ঠাঁই অধিকার করিয়াছিল, কাহাকেও অবহেলা করিতে তাহার মনটা দ্বিধা সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। এরা সকলেই দুঃখী দুঃখের গ্লানি সে সমানভাবেই সকলের নিকট হইতে পাইত। হয়তো কিছু ত্যাগও সে করিতে পারিত, কিন্তু রাস্তার ওপারের ওই বাড়ীর লাউড স্পীকার হইতে যখন রেডিওর গান ভাসিয়া আসিত তখন এই জীবন-যাত্রা, কোন মতে এই বাঁচিয়া থাকিবার সার্থকতা সে খুঁজিয়া পাইত না। অমনি করিয়া কি ওদের মত বাঁচিয়া থাকা যায় না? যদি এমন একটী সুযোগ আসে! এ অভাগ্যদের ত ছাড়িয়া যাইতে কান্না পায় সত্যি! কিন্তু যারা অসহায়, তাদের দলে মিশিয়া কেন সে সহায়হীনের মত দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবে! এর কোন যথার্থ হেতু খুঁজিয়া পায় না। ওদের কোনো উপায় নাই, ওরা অমনিভাবেই মরিবে। কিন্তু তার একখানা কাপড়,—একটু সোনা—যাহা সকলেরই আছে, তাহাও নাই!—কখনও কখনও এমনি করিয়া স্বরূপা যেন নিজেকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিত।

অকস্মাৎ অভাগ্য-সঙ্ঘের নীড়খানি একদিন প্রবল ঝড়-বৃষ্টির দুর্য্যোগে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল—

অভিনয়ের দিনে স্বরূপা ফিরিত রাত্রি একটা দেড়টায়, কিন্তু গত রাত্রে সে আর ফিরে নাই। বগলা সন্ধান লইয়া আসিয়াছে—কাল রাত্রে একটি ধনী যুবকের মোটরে উঠিয়া সে উধাও হইয়াছে। থিয়েটারের অন্যান্য মেয়েরা এই ব্যাপারটী লইয়া বগলাকে একটু বিদ্রূপ ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়ে নাই।

বগলা ব্যস্তভাবে, শুষ্কমুখে চলিয়া আসিয়াছে।

বাসায় আসিয়া সে বলিল,—ও আমি জানতুম। ও যাবেই। মেয়েদের মন দুর্ব্বল তাই তাদের মন সংকীর্ণ ও স্বকীয় সুখান্বেষী! ওরা তাই আভিজাত্যের বেশী অনুরাগী—কিন্তু এ ত অন্যায় অনুরাগ, এর কোন মানে হয়?

বিনোদ বলিল—আমারও তাই মনে হয়, গরীবদের বৌ যদি ভাল সুযোগ পেত আর কোন বাধা-বন্ধন না থাকতো, তবে তারা সে অস্বচ্ছল গৃহস্থালীর মাঝে কিছুতেই থাকতো না। সংস্কৃতেও কি একটি কথা আছে, কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং……মাতারাও বিত্তই চায়।

বিপিন প্রতিবাদ করিল,—ওসব বাজে কথা, গরীবদের বৌ বেশী পতিপ্রাণা হয়।

বগলা তাচ্ছিল্যের সহিত ক্ষণিক হাসিয়া লইয়া কহিল—তার মানে, স্বামীটিকে বাদ দিলে তারা একেবারেই অসহায়।

বিপিনের তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না, সে চুপ করিয়া রহিল—তাহার অন্তর তখন নিরুদ্দিষ্ট একটী নারীর অশ্রুত পদ শব্দের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে, যে ছিল সে আর আসিবে না, এইটুকুই বারবার মনের মাঝে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিনোদ বলিল,—বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছে না ?

বগলা বলিল—তা অবশ্যি অস্বীকার করা যায় না। বাড়ীর কুকুরটি মারা গেলেও মনটা ভার হ'য়ে থাকে—এতে অস্বাভাবিকতা একটুও নেই।

—এ অস্বস্তিকে স্থান দেওয়া ঠিক নয়—আজ আমরা তার উদ্দেশ্যে উপবাস করি, কাল ধুয়ে মুছে আবার নূতন জীবন-যাত্রা সুরু করা যাবে।

বিপিন সম্মতি দিল,—আর আজ রাঁধিবার মত ইচ্ছা বা সামর্থ্য কাহারও নাই।

বিপিন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, অবশেষে 'যাক্‌গে' বলিয়া খানিক নারিকেল তেল মাথায় মাখিয়া ফেলিল। বগলা জীর্ণ ছাতাটি কাঁধে ফেলিয়া আফিসে রওনা হইল—

বিনোদও কিছুপরে বাহির হইয়া গেল—

বিপিন নিষ্ঠার সহিত ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু শূন্যোদরে কিছুতেই ঘুম আসে না। চাহিয়া দেখিতে লাগিল, উপরের দেওয়ালের গায়ে কতকগুলি ছবি, ক্যালেণ্ডার টাঙানো রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ঝুল-কালিতে সেটা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, স্বরূপার যত্নে এখন শ্রী ফিরিয়াছে।

একখানা মেমসাহেবের মুখ-আঁকা ক্যালেণ্ডার, কাহারও সৌন্দর্য্য-প্রীতির দুর্ব্বলতায় ভর করিয়া চার বৎসর পূর্ব্বে ঘরে ঢুকিয়াছিল। আজো অর্দ্ধবিবস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াই আছে, এই চার বৎসর ধরিয়া হাসিমুখে চাহিয়াই আছে, সে হাসির কোন পরিবর্ত্তন নাই! বিপিনের কাছে এই হাসিই আজ ক্লান্তিকর বলিয়া মনে হয়—

হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া ছবিখানি সে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিল। শুধু অর্থহীন রঙের সমারোহ।

আরও কিছুক্ষণ পরে বিপিন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, উত্তপ্ত রৌদ্র

গায়ের মাঝে সূচের মত ফোটে, চোখের সুমুখে ঝিল্‌মিল্ করে, বিপিন ভাবিল, তা হোক, এই সবুজ গাছগুলি কেন মরিয়া যায় না! মানুষের জীবন সম্বন্ধে নানা হাস্যকর তথ্য তার মাথায় যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

পায়ে চোট লাগিয়া নখটি একটু উঠিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছিল, তা হোক। ক্ষত টিপিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়া বিপিন আবার চলিতে লাগিল।

উপবাসী দেহে অল্পক্ষণ পরেই ক্লান্তি দেখা দিল। অশক্ত পা'দুটি আর দেহভার বহন করিতে পারে না। পকেটে হাত দিয়া দেখে নগদ চারি আনা বিদ্যমান। ভাবিল, যে তাহাদের স্নেহকে তুচ্ছ অর্থের জন্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, পিছন ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে নাই, কেবলমাত্র তাহারই স্মৃতির সম্মানার্থে এ উপবাস অসম্মানকর, নিজেদের দুর্ব্বলতার পরিচয়। আর একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল,—ইহার মাঝে ক্রোধের উষ্ণতা নাই, স্থির মস্তিষ্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। জীবনে নিষ্ঠার মত পরিহাস আর নাই, স্মৃতির তপস্যাই সবচেয়ে লজ্জাকর।

বিপিন সম্মুখের ডালপুরীর দোকানে ঢুকিয়া পড়িল—

বগলা অফিসে যাইয়া বসিতেই হেড্-কম্পোজিটার আসিয়া বলিল—দশের ফর্ম্মার শেষটায় তো জায়গা থেকে গেল, টেল্-পিসই দেব, না কবিতা টবিতা দেবেন একটা।

বগলা বলিল—দাঁড়ান দেখি—

ড্রয়ারের মধ্যে কতকগুলি কবিতা ছিল, এক একটি করিয়া পড়িতে লাগিল। অশোকা সেনের লেখা, 'বিদায়-ব্যথা', বীথিকা দাসের লেখা 'অভিসার' সুতপা রায়ের 'অতিথি', করুণা চ্যাটার্জ্জীর 'পূজারিণী' মর্ম্মর মৈত্রের 'হৃদয়-দেবতা'—সবই নারীর লেখা এমনি এক ভজন প্রেম-কবিতা।

বগলা বলিল,—একটা টেল্-পিসই দিয়ে দিন, ও সব মেয়েদের লেখা প্রেম-কবিতা—ওর কোন মানে হয় না।

হেড্-কম্পোজিটার সত্তপরিণীত, নারীর প্রতি তাহার অহেতুক আকণ্ঠ দরদ, বলিল—কেন? ও সব তো ভাল।

বগলা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—ও সব মিথ্যে কথা মশাই, ছাপাতে পারবো না, ওতে কাগজের দুর্নাম হবে।

চার পাঁচ দিন পরে প্রোপ্রাইটার মাথায় হাত দিয়া আসিয়া বলিলেন—মশাই, ক'রেছেন কি? কাগজটাকে উঠিয়ে দিতে চান?

বগলা বলিল,—কি হ'য়েছে?

—আর কি হ'য়েছে! সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, এবার দু' তিনশো কপি সেল কমে যাবে।

—কেন? স্বপ্ন দেখেছেন?

—না মশাই, না। আর্ট-ফার্ট ভাল না বুঝলেও ব্যবসাটা ভাল বুঝি, নইলে বাংলা কাগজ নিয়ে দাঁড়াতে পারতুম না। একটাও মেয়ের লেখা নেই! মশাই জানেন? এক একজনের গড়পড়তায় পঞ্চাশ জন এ্যাড-মায়ারার; চার জন লেখিকার লেখা দিলে, দুশো কপি বিক্রি, একশো টাকা।

বগলা হাসিয়া বলিল,—ওদের লেখা যে কোনটাই ছাপার মত নয়।

স্বত্বাধিকারী ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটে দেখিলেন, একটা কবিতার পাশে লেখা রহিয়াছে—অমনোনীত।

তুলিয়া লইয়া দেখেন, সুন্দর প্রেম কবিতা।

চৈত্র মাসে আমার কাঁদন
ঘুঘুর চোখে ঝরে।

কবিতাটি মঞ্জরী মিত্রের। বলিলেন—এ কবিতাটি এখানে ফেলেছেন, সর্ব্বনাশ! জানেন ডায়োসেসন কলেজের ইনিই সব চেয়ে সুন্দরী ছাত্রী ?

বগলার শীত করিয়া জ্বর আসিতেছিল। জড়সড় হইয়া চেয়ারে বসিয়া বলিল,—তা হ'লে সম্পাদকীয় মন্তব্যের শেষে কি লিখে দেব, লেখিকাগণ দয়া ক'রে লেখার সঙ্গে ফটো পাঠাবেন ?

স্বত্বাধিকারী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—সাহিত্যিকদের বুদ্ধিটাই মোটা, মশাই জানেন এর—এ্যাডমায়ারার হয়তো একশোর ওপর ? আপনি যদি এসব না চালাতে পারেন, তবে চাকরী ছেড়ে দেবেন।

বগলা অফিস হইতে বাহির হইয়া দেখিল গায়ে দু' ডিগ্রী জ্বর। সমস্ত দেহ অবসন্ন, ক্রমাগত বমনোদ্রেক হইতেছে। রাস্তার পাশে বসিয়া বমি করিতে চেষ্টা করিল, একটু পিত্তও বমি হইয়া গেল, কিন্তু বমনোদ্রেক কমিল না। সমস্ত দেহ মাতালের মত টলিতেছে, চোখ দু'টি চেষ্টা করিয়া খুলিতে হয়। আর একটু যাইতেই আর একবার বমি! প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে পাকস্থলী যেন গলার মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এরূপ দেহ লইয়া বাসায় পৌছান কষ্টসাধ্য, পকেট খুঁজিয়া দেখিল চারিটি পয়সা তখনও আছে।

বগলা বাস্-ষ্ট্যাণ্ডের নিকট দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, একটা লাইট-পোষ্ট হেলান দিয়া বসিয়া বমি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পাশেই একটি বিপুল-পরিধি ছাত্রী বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। হাতের খাতা বই দেখিয়া বোঝা যায় ইনি পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের ছাত্রী।

দোতলা বাস আসিয়া থামিল, বগলা অতিকষ্টে বাসে উঠিয়া দেখে

একখানি মাত্র বেঞ্চ খালি ছিল, দুইটি সিট, কিন্তু ঠিক মাঝখানে মহিলাটি বসিয়াছেন। বগলা যথাসাধ্য বিনয়ের সহিত বলিল—দয়া ক'রে একটু ব'সতে দেবেন ?

মহিলাটি ক্রুদ্ধ নেত্রে একবার বগলার নিমীলিত প্রায় চোখের দিকে চাহিয়া, অধিকতর বিস্তৃত হইয়া বসিলেন। বগলা দ্বিতীয়বার তাহার অবস্থা জানাইয়া আবেদন করিতে পারিল না,—কথা বলিতে গেলে মনে হইতেছে যেন শ্রোতার গায়ে বমি করিয়া দিবে। বগলা নিশ্চেষ্ট হইয়া হাণ্ডেল ধরিয়া বমির বেগ এবং বাসের তালে তালে দুলিতে লাগিল।

মহিলাটি আশুতোষ বিল্ডিংএ নামিয়া গেলেন, বগলাও বমির বেগ দমন করিতে নামিয়া পড়িল।

বগলা পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল,—কেন সে বসিতে দিল না! যদি মাতাল ভাবিয়া থাকে তবে তাহা তাহার ইতর মনের পরিচায়ক। মেয়েরা স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু মনের এ ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করে নাই কেন ?…

…ট্রাম বাসে সর্ব্বত্র যে সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা তো পুরুষেরই একান্ত অবহেলার সহিত দেওয়া একটু সমবেদনা, ওদের দুর্ব্বলতা তাহাই হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে। অথচ এই ভিক্ষালব্ধ একটু সুযোগকে ওরা নির্লজ্জের মত, মূঢ়ের মত, সম্মান বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছে! কিন্তু এই সম্মানটা যে তাহাদের আত্মশক্তির, আত্মনির্ভরতার কত বড় অপমান তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না।

বগলা বাড়ী ফিরিয়া, অসুস্থ শরীরেই এই ঘটনাটি উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিল,—একটি নারীর অভদ্র ব্যবহারে আমার জীবনের দুঃস্থ পাঁচ মিনিট যে আরও ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমারই উপন্যাসের আয়ুর সহিত অক্ষয় হইয়া থাক! ভবিষ্যৎ যুগে এই অবিচারের

কাহিনী উহাদের কলঙ্কই হইয়া থাকিবে। আমার এ উপন্যাস যদি কোন দিন, এই মহিলাটির হাতে পড়ে, তবে সেই দিন সে বুঝিবে,—যে লোকটি রোগাক্রান্ত হইয়া অসহায়ের মত নির্ব্বিবাদে তাহার অবিচার সহ্য করিয়াছিল, সে কেমন নিষ্ঠুর ভাবে তাহার উদ্দেশ্যে কলমের মুখে তিরস্কার ছিটাইয়া তাহার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়াছে।

বিনোদ একখানি ছবি আঁকিতেছে—

নিশীথ অন্ধকার রাত্রি। নদীর চরে চখা অন্ধকারে চখীর সন্ধানে ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিরহ-বাহিনীর অশ্রান্ত গতি। ওপারে চখী নিশ্চিন্ত মৌনতায় একপায়ের উপর ভর দিয়া ঘুমাইতেছে—

বিনোদ বাজার করিতে গিয়াছিল—

বগলার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, সে বসিয়া দেখিতেছিল,—ছবির লাইনগুলি বেশ বোল্‌ড হইয়াছে, চখা চখীর ভঙ্গী বেশ সুপ্রকাশিত কিন্তু চখাটির অমন করিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া ব্যস্ত ব্যাকুল ভাবে খুঁজিয়া বেড়ানো, এই ক্ষুব্ধ সজল দৃষ্টি—ও যেন পুরুষজাতিকে অপমান!

ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বগলা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহার স্রষ্টার অন্তর ক্লেদপূর্ণ দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে তার মন ক্লান্তি বোধ করে, বগলা ছবিখানি ছিঁড়িয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলিল, তাহাতেও শান্তি হইল না, চখার সমস্ত গায়ে ম্যাণ্ডারিন ব্ল্যাক মাখাইয়া দিল।

বিপিন তরকারী কুটিতেছিল, বলিল,—কি ছিঁড়িস্?

—বিনোদের ছবি!

বিপিন সহানুভূতি জানাইয়া বলিল,—বেশ হ'য়েছে।

বিনোদ বাজার হইতে ফিরিয়া দেখে—যাহা সে এই কয়েকদিন সমস্ত অন্তরের দরদ ঢালিয়া আঁকিয়াছিল তাহা শেষ দশায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

পরিশ্রান্ত দেহের রক্ত অন্তরের সহিত সমারোহে টগবগ করিতে লাগিল। গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—ছবি নষ্ট ক'রেছে কে?

বগলা বীরত্ব ব্যঞ্জক সুরে বলিল—আমি।

—কারণ?

—ও ছবিখানা প্রকাশিত হ'লে সমস্ত পুরুষ জাতিটা অপমানিত হবে।

—আমার যা খুশী তাই ক'রবো, তোর তাতে কি?

—আমারও যা খুশী তাই ক'রবো।

—তোর খুব বেশী স্পর্দ্ধা হ'য়েছে দেখছি—

এমনি আরও কিছু বাদানুবাদের পরে বিনোদ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত বগলাকে আক্রমণ করিল। বিনোদ অপেক্ষাকৃত বলবান, বগলা শুধু আত্মরক্ষারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

ফলে—

সর্ব্বরঙসমন্বিত জলের গামলাটা উল্টাইয়া মাদুর ভিজাইতে লাগিল ও দুইটি তুলির হ্যাণ্ডেল ভাঙিয়া গেল।

বিপিন দৌড়াইয়া আসিয়া বিনোদের হাত ধরিয়া বলিল—এক মিনিট দাঁড়াও, তার পরে মারামারি ক'রো—ত্যাখো, তুমি শিল্পী নামের অযোগ্য—তুমিও সাহিত্যিক নামের অযোগ্য।

সহসা তাহাদের অন্তরের পরিচয়ের উপর কবিকৃত এমন মর্ম্মভেদী নির্জ্জলা দোষারোপে দুই জনেই উঠিয়া বসিয়া হাঁ করিয়া রহিল।

বিপিন বলিল,—মারামারি করে পশুতে বা পশুবৎ মানুষে অর্থাৎ শিভাইল্‌রাস নাইটহুডকে আমি পাশবিক সহজ-প্রবৃত্তি ছাড়া কোন বিশেষণ দিতে পারি না।

বিনোদ লজ্জিত হইয়া বলিল,—বগলা যাও রাঁধতে।

বগলা নিশ্চিন্তে শুইয়া বলিল,—অতটা মার হজম ক'রে নি, দাঁড়াও।

বিনোদ আরও লজ্জিত হইয়া ষ্টোভ ধরাইতে গেল। এমনি ছোট-খাট মারামারি বা রক্তারক্তি তাহাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনামাত্র!

ভবঘুরে সঙ্ঘের ভাগ্যাকাশে, দুর্ভাগ্যের মহাদুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিল।

অফিস হইতে বগলা যে জ্বর লইয়া ফিরিয়াছিল, দুই একদিন তাহা লইয়াই নিয়মিত অন্ন-পথ্য ও অফিস করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, জ্বরজীবটা ভয়েই পলায়নপর হইবে, কিন্তু জ্বরটী এবার আদি ও অকৃত্রিম ভাবে বাঁশ-গাড়ি করিয়া বগলার দেহকে দখল করিয়া লইল। বগলাও নিরাপত্তিতে ছিন্ন মাদুর ও ময়লা বালিশটাকে আশ্রয় করিল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে অফিসে দেহ ও হাতের অবস্থা জানাইয়া সে পত্র দিয়াছিল কিন্তু স্বত্বাধিকারী মহাশয় ব্যবসায়ী লোক, আজ উত্তর দিয়াছেন। পত্রের মর্ম্মার্থ এই—

কাগজের অফিসে কামাই করিলে চাকুরী থাকে না এ অভিজ্ঞতা লাভ করুন। কুড়ি টাকায় সহঃ-সম্পাদকের অভাব নাই, যোগ্যতর অন্য ব্যক্তি পাওয়া গিয়াছে। আপনার যৎসামান্য পাওনার জন্য পুনরায় তাগাদা করিলে অফিসে অনুপস্থিতি হেতু যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য অন্ততঃ পাঁচশত (৫০০৲) টাকা দাবী দিয়া ড্যামেজ সুট ফাইল করা হইবে।

বগলা পত্রখানার শীর্ষদেশে আনত ললাট স্পর্শ দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বিনোদ অনেকক্ষণ যাবৎ 'হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা' চাহিয়া আনিয়া পড়িতেছিল। সহসা চীৎকার করিয়া বলিল—বগলা হ'য়েছে, তোর বুকে ব্যথা আছে না? শরীরে জ্বালা আছে—এই এসিড

ফস নির্ঘাত লাগবে, বেলেডোনায় হবে না। বিপিন মেটিরিয়া মেডিকা পড়িতেছিল, বলিল, এই ছাখো অর্ণিকা থাটি ঠিক মিলেছে, ব্যথা সূচের মত ফোটে, না ?

বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর ঠিক হইল, এ্যাসিড্‌ ফস্‌ দুশো—

—হাতে তো আছে চার আনা। বাজার ক'রতে হবে, আচ্ছা তিরিশ হ'লেও হবে।

বগলা হাসিয়া বলিল—যে কোন একটা হ'লেই হ'ল।

বিনোদ কর্ম্মী, বাজারে রওনা হইল।

বিপিন ভাঙা বেহালা বাজাইতে বাজাইতে বলিল—বাস্তবিকই, হ্যানিম্যান মহাপুরুষ, তিনি যদি এই পাঁচ পয়সায় ওষুধ না আবিষ্কার ক'রতেন তবে গরীবদের যে বিনা চিকিৎসায় ম'রতে হ'তো !

বগলা অনুমোদন করিয়া বলিল—সত্যি।

আরও কিছুদিন এপিস, বেলেডোনা, ইপিকাক দিয়াই চলিল। বিনোদ ছবির জন্য পাঁচ টাকা পাইয়াছিল, তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল, কিন্তু বগলার ব্যথা বিন্দুমাত্রও কমিল না। নিত্য-আহার্য্য সংগ্রহের নানা ফন্দীও আবিষ্কৃত হইতে লাগিল।

রুগ্ন বগলা শীর্ণ দেহখানাকে এলাইয়া দিয়া দিবারাত্রি জীর্ণ মাদুরে শুইয়াই থাকে। মাঝে মাঝে শুধুই ভাবে; কখনও 'পারিবারিক চিকিৎসা' হইতে ওষুধ বাছাই করে। ঘরের ছবি দুইখানি, দু'খানা ক্যাটালগ, ঘটি-বাটি, কড়ি-বরগা সব মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। নীচের তলায় মেথরেরা উচ্চ-কণ্ঠে প্রতিবেশীকে তিরস্কার করে, ওইটুকুই তার রোগশয্যার উপভোগ্য নূতনত্ব। ভাতের লোভে আসিয়া চড়ুই ফিরিয়া যায়, টিকটিকিগুলির গতিবিধি, এমন কি তাহাদের মধ্যে কাহার সহিত

কাহার ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর সে কথাটাও সে অনায়াসে মুখস্থ কবিতার মত বলিয়া দিতে পারে। এমনি করিয়া আরও কিছুদিন গেল—

সন্ধ্যায়ই জ্বর আসে, জ্বর বেশী নয়, তবে জ্বালা যন্ত্রণা প্রচুর। শরীরটাকে ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া যায় এমনি।

সন্ধ্যায় অন্ধকারের সহিত কয়লার ধোঁয়া মিশিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতেছিল। বুকের বেদনাটা জ্বর ও ধোঁয়ার নিষ্পেষণে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে ; দুর্ব্বল পঞ্জরগুলি দীর্ণ হইয়া যাইতে চায়। বগলা ভাবিতেছিল—

এই ঘরখানির এইখানটায় হয়ত এমনি করিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। যদি তৃষ্ণা পায়, জল কেউ দিবে না। না দিক্ ক্ষতি নাই। দুইবার ঢোক চিপিলেই যাইবে। চোখ দুটি বেদনায় বিকৃত করিয়া জ্ঞান হারাইব, বুকের বেদনাস্থানে বাম হাতখানি থাকিবে ; ওরা আসিয়া হয়ত দেখিবে—মরিয়া আছি। ধার করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে। দুই পাশে এত বাড়ী, এত লোক, কেহই জিজ্ঞাসা করিবে না—

কে ? কেহই জানিবে না, চোখের জলও কেহই ফেলিবে না। মা, ভাই, বোন নাই, বিনোদ বিপিন হয়তো দুফোঁটা চোখের জল ফেলিবে, ধনী বন্ধু রমেশ হয়তো বা আহা বলিবে,—ব্যস্ একটা অর্থহীন জীবন ! তাহার অনাড়ম্বর পরিসমাপ্তি !

রুদ্ধ দরজায় কড়ার শব্দ হইল। বহু কষ্টে পায়ের উপর ভর দিয়া বগলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সব অন্ধকার, কোনমতে হাতড়াইয়া দরজা খুলিয়া দিল।

—কে ?

—আমি,—স্বরূপা।

—স্বরূপা !

—হ্যাঁ,—ওকি বগলাবাবু, আপনার জ্বর নাকি ?

—হুঁ।

স্বরূপা আলো জ্বালিল।

বগলা দেখিল, স্বরূপার ঘন কৃষ্ণ কেশপাশ রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালির প্রলেপ, চোখ দুটি রক্তাভ, শরীর কৃশ বিশীর্ণ, ওষ্ঠে পানের শুকনো দাগ।

স্বরূপা বগলার মুখখানি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল,—জ্বর ক'দিন?

—যেদিন থেকে তুমি নেই—কোথায় ছিলে?

স্বরূপা বলিল,—সে অনেক কথা, শুন্‌বেন?

—ব'সো।

স্বরূপা বগলার মাথার শিয়রে আসিয়া বসিল। বগলার রুক্ষ চুলগুলির উপর হাত রাখিয়া বলিতে সুরু করিল,—একটা কথা কয়েকদিন যাবৎ কেবলই মনে হ'চ্ছিল—এই এমন ক'রে বেঁচে থেকে কি হবে, একখানা কাপড়ও নেই। সুযোগও জুটে গেল, একটা বড়লোকের ছেলের দৃষ্টি আমার উপরই পড়েছিল। ভাবলুম—যাই, যদি একটু ভদ্র হ'য়ে থাকবার মত হ'য়েও ফিরি। আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করিনি, ক'রলে যাওয়া হ'ত না। এতদিন কি ক'রেছি জানেন? অনেক বোতল মদ, আর অনেক নাচ যতক্ষণ না পা শিথিল হ'য়ে আসে। এমনি ক'রেই কয়েকটি দিন চ'ললো। তার পরেই ক্লান্তি! চলে এলুম। পঁচিশটি টাকা মাত্র আছে, আর সব খরচ হ'য়ে গেছে। চাকুরীটাও গেছে—ও চাকরী ক'রতে আর সাধ নেই, গেছে বালাই গেছে। এবারও কি একটু আশ্রয় দেবেন?

বগলা পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল,—তুমি চ'লে গেছ ব'লে আমাদের এতটুকুও অভিমান নেই, তোমাদের পক্ষে এমনি চ'লে যাওয়াই তো খুব স্বাভাবিক।

স্বরূপা বুঝিতেছিল, বগলা যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। পাখাখানা লইয়া বাতাস করিতে বসিলে বগলা বলিল,—থাক্। তুমিও বড় ক্লান্ত হ'য়ে এসেছ—

—মোটেই না, একটু বাতাস করি।

বগলা নির্ব্বিকার ভাবে বলিল—কর।

—ব্যথা বুকে!—স্বরূপা ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওতো বড্ড খারাপ অসুখ বগলাবাবু।

বগলা ম্লান হাসিয়া বলিল—হ'লেই বা কি ক'রছি বল! এসিড ফস খেয়েছি, সেরে যাবে।

স্বরূপা বলিল,—হোমিওপ্যাথিতে আপনার বিশ্বাস হয়?

—গরীবদের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করা উচিত।

—না বগলাবাবু, টাকা ক'টা তো আছে, কাল ডাক্তার দেখিয়ে আসুন!

—ওসব কাজ নেই, কাল মাংস পোলাও রাঁধো।

—এই জ্বরের মাঝে!

—তাতে কি? কতবার ওই ক'রেই জ্বর তাড়িয়েছি!

দুই জনেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। কেবলমাত্র একটা তেলের কল অবিশ্রান্ত একঘেয়ে শব্দ করিতেছে। বগলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—স্বরূপা একটা কথা সত্যি ক'রে ব'লতে পার?

—বলুন।

মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া বগলার অন্তর আজ এপারে একটা আকর্ষণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সে বলিল—আমি যদি ম'রে যাই, তা হ'লে তুমি কাঁদতে পারবে তো?

স্বরূপা এমন একটা প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল—হয় তো পারবো—কিম্বা কি জানি ?

নীচে একতলায় একটা খোলার ঘরের চৌকাঠ হেলান দিয়া, কৃশ একটি শিশু কোলে করিয়া একটা কুলি নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার চিত্তে ঘুমাইতেছে।—দিনের ক্লান্তি যেন বদ্ধ ঘরের হাওয়ায় মিশিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, স্ত্রী উল্‌কী-পরা হাত দুইখানি নাড়িয়া রুটি তৈয়ারী করিতেছে, সম্মুখে কেরোসিনের ডিবের শীর্ণ শিখা বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। স্বরূপা বলিল,—দেখুন কি সুন্দর জীবন !

বগলা উঠিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বলিল,—হুঁ। ক্ষণেক পরে আবার বলিল,—স্বরূপা, তুমি সত্যি আমার জন্য ভাবো ?

—ঠিক জানিনে। তুমিই বলো না ?

—স্বরূপার মুখে এমনি নৈকট্যের ভাষা এই প্রথম !

বগলা কথা বলিতে পারিল না। শীর্ণ হাতখানা তুলিয়া শুধু স্বরূপার হাতের উপর রাখিল। অস্বচ্ছ অন্ধকারে কুশ্রী ঘরখানা হঠাৎ যেন মোহময় হইয়া উঠিল।

বিপিন ও বিনোদ ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া বলিল—বগলা আজও বায়ু-ভুকের মতই থাকতে হবে,—একি, স্বরূপা যে !

পর পর কৌতূহলী দুই বন্ধুর অনেকগুলি ধারাবাহিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া স্বরূপা বিব্রত হইয়া পড়িল।

সকালে স্বরূপার গম্ভীর আদেশে বিপিন বাজারে এবং বিনোদ ও বগলা রিক্সা করিয়া ডাক্তারখানায় গেল।

বাঙালীর দোকান,—আড়ম্বর নাই। বাইরে লেখা ফেনাইল, মেথিলেটেড স্পিরিট। ডাক্তার এম, বি, একটা মেডেলও আছে।

রোগীর ভীড় নেহাৎ মন্দ নয়। কিছু পরেই ডাক পড়িল। ডাক্তার স্টেথিস্কোপ বুকে দিয়া খানিক চুপ করিয়া শুনিলেন, ভিতরে শ্বাস বৈক্লব্য ঘটিয়াছে কিনা। নাড়ী দেখিয়া, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—মশায়ের প্লুরিসি হ'য়েছে।

বগলা বড় বড় ক্লান্ত চোখ দু'টি মেলিয়া বলিল,—অর্থাৎ ?

—একটা রোগের নাম,—এখন থেকে ভাল ক'রে চিকিৎসা না হ'লে থাইসিস্ হ'তে পারে। খাবার জন্য কয়েকটা পেটেণ্ট, দাম পাঁচ ছ' টাকা, কয়েকটি ক্যালসিয়ম ইন্জেকসন ক'রতে হবে, আর সি-সাইডে গিয়ে থাকতে হবে।

বগলা ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

—ডেইলি মাখন, ডিম ও দুধ একসের খেতে হবে, বুঝলেন ?

বগলা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ!

নমস্কার জানাইয়া বগলা ও বিনোদ রাস্তায় বাহির হইল। বগলা বলিল—চল্ রেস্তোরাঁয়, ওষুধ কিনলেও ত যেত কিছু—

বিনোদের হোমিওপ্যাথির উপর নিদারুণ বিশ্বাস, বলিল—ওরা কিছু জানে না, টাকা আদায়ের ফন্দী। দুইজন রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়া প্রচুর খাইয়া ফেলিল। বিনোদ অনেকদিন পরে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—রিক্সা ডাকবো,—না,—চল্ হেঁটেই যাই।

সাম্নেই একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান। বিচিত্র রঙের সমারোহ পথিকের চোখে আসিয়া লাগে। মোটর আসিয়া রাস্তায় দাঁড়ায়, রং-বেরঙের শাড়ী-পরিহিতা তরুণীর দল কাপড় পছন্দ করে, সহসা পছন্দ হয় না। বগলা বড় বড় চোখ করিয়া দেখে, ওরা অত টাকার কাপড় দিয়া কি করে! পরে? পরিলেই ত দুইদিনেই

ছিঁড়িয়া যায়! বিনোদ বলিল,—চল্ দুটো পাঞ্জাবী নিয়ে আসি। বগলা সোৎসাহে অতি আবশ্যকীয় প্রস্তাবে প্রীতি নিবেদন করিল।

দোকানের একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া দেখিল একজন কর্ম্মচারী একখানা অপছন্দ শাড়ী হাতে করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান মোটরের নিকট হইতে ফিরিতেছে; বিনোদ নেহাৎ কৌতূহলপরবশে জিজ্ঞাসা করিল,—ওর দাম কত?

—পঞ্চান্ন টাকা বার আনা—

বিনোদ বলিল,—মাত্তর!

—আজ্ঞে, এর চেয়েও ভাল জিনিষ মজুত আছে, দেখবেন?

বগলা বলিল,—আজ্ঞে না, দেখছেনই আমরা অকৃত্রিম পুরুষ মানুষ।

—কিন্তু মা-লক্ষ্মীদের,—

—আহা, আমাদের সমবেত দুর্ভাগ্য যে মা-লক্ষ্মীরা এখনও আমাদের লক্ষ্য ক'রে উঠতে পারেন নি?

—তবে?

—দু'টো, লংক্লথএর ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী।

দুইটি পাঞ্জাবী ও একখানা গামছা কিনিয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িল। একুনে দুই টাকা খরচ হইয়া গেল, তা হোক। অন্তরে উল্লাস, দেহে ভুক্ত উষ্ণ-খাদ্যের ক্রিয়া। রাস্তার ধারে বড় বাড়ীর গাড়ীবারান্দায় বসিয়া ভিখারী কাতরস্বরে ভিক্ষা চাহিতেছে। বগলা উদারভাবে হাতের উপর একটা আনি ফেলিয়া দিল। বাসায় ফিরিয়া দেখে, ষ্টোভের উপর পোলাওএর জল তৈয়ারী হইতেছে। স্বরূপা জিজ্ঞাসা করিল—ডাক্তার কি ব'ললে?

বগলা ক্রুদ্ধস্বরে জবাব দিল,—বেটা মুখ্খু আহাম্মক, বলে প্লুরিসি। যার তার প্লুরিসি হ'লেই হ'লো?

দেহ বিনিময়ে উপার্জ্জন করা স্বরূপার পঁচিশটা টাকা ও বগলার বুকের বেদনা একই অনুপাতে কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যেদিন যৌথ তহবিল মাত্র একটি চতুষ্কোণ দুয়ানি ও একটি অচল সিকিতে আসিয়া পরিণত হইল, ঠিক সেইদিনই হি হি করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া স্বরূপার জ্বর আসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল কাশি প্রচণ্ড মাথাধরা। স্বরূপা অচৈতন্য হইয়া বগলার জীর্ণ মাদুরে আশ্রয় লইল।

তিনবন্ধু কলরব করিয়া 'পারিবারিক চিকিৎসা' পড়িতে সুরু করিল। ঠিক হইল, আর্সেনিক তিরিশ।

বিনোদ সারাদিন অনাহারের পর বৈকালে, আর্সেনিক তিরিশ ও তিনখানি বড় পুরী লইয়া ফিরিল। বলিল—অচল সিকিতে আধমরা ক'রে ছেড়েছে। বাস ট্রাম বিড়ির দোকান সর্ব্বত্রই লোকের চক্ষু অসম্ভব রকমের সাফ্, শুধু এই তোমরা ছাড়া। বিনোদ হাতপাখা লইয়া বাতাস খাইতে লাগিল।

বৈকালে পুনরায় জ্বরের প্রাদুর্ভাব পূর্ণবেগে দেখা দিল। এবার বহু সুচিন্তার পর স্থির হইল, 'মার্কুরিয়স্ সল্' কিন্তু অচল সিকি লইয়া পুনরায় বাহির হওয়া বেকুবি, কাজেই রাত্রির মত নিরস্ত হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

সকালে স্বরূপা দেহের জ্বালায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। বিপিন ভাঙা বেহালা বাজাইয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, বিনোদ ও বগলা রওনা হইল ঔষধ এবং পথ্যের সন্ধানে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে সুরু করিয়া এস্‌প্লানেড অবধি বেলা বারোটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও বগলা কোন উপায় ঠিক করিতে পারিল না। ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ীর দিকেই ফিরিতেছিল অকস্মাৎ দেখা গেল বহুবাজার ষ্ট্রীটের ফুটে স্কুলের একটি সহপাঠি ছাতা

লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। বগলা নামটা স্মরণ করিয়া বলিল,—আরে খগেন যে! বহুকাল পরে দেখা, সত্যি। কেমন আছিস্? কোথায় যাচ্ছিস্? কি ক'র্‌ছিস্?

খগেন বুদ্ধিমান শিষ্ট ভদ্রলোক। বলিল—বগলা যে! কেমন আছিস্। আমি ভাই ওকালতি ক'র্‌ছি আমাদের শহরে। ভাইটির বিয়ে, কাপড়-চোপড় কিন্‌তে এসেছি!—

—বেশ বেশ, তোরও বিয়ে হয়েছে তা হ'লে, ছেলে-পুলে?

—একটি ছেলে।—

—বেশ ভালই, শুনে খুব আনন্দিত হ'লাম। স্ত্রীর সঙ্গে ভাব-সাব ভালতো?

—নিশ্চয়ই,···আয় ভাই, নূতন বৌয়ের কাপড়টা কিনি। চল্ না বিয়েতে একটু স্ফূর্ত্তিও হবে, পুরোনো পরিচয়টাও রিপু করা হবে।

—আচ্ছা সে হবে'খন, চল্ একটু চা খেতে খেতে সব শুনি।

সম্মুখেই দোকান! বগলা চা হইতে সুরু করিয়া চপ, কাটলেট প্রভৃতি সহযোগে বন্ধুকে পরিতোষ আহার করাইল। অজ্ঞাতে দুই একখানি কাটলেট পকেটে ফেলিয়া কবির জন্য সঞ্চয়ও করিয়া লইল। বন্ধু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সত্যি চল না, কবে যাবি বল্।

বগলা দোকানীকে বলিল,—কত হ'য়েছে?

—আড়াই টাকা।

বগলা পকেটে হাত দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—এ্যাঁ আমার মণিব্যাগ! বাসায় ফেলে এসেছি, না পকেট-কাটা—সর্ব্বনাশ! কি হবে ভাই, সবে কাল মাইনে পেয়েছি, সব টাকাই যে তার মধ্যে।

—কত ছিল রে বগলা?

—পঞ্চাশ টাকা।

বন্ধুর এমন আকস্মিক দুঃখে খগেন প্রকৃতই দুঃখিত হইয়া বলিল—ভাই, বাড়ীই ফেলে এসেছিস্—আচ্ছা বিল আমি পে আপ্ ক'রছি। বন্ধুবর টাকা দিয়া দিল।

বগলা আন্তরিকতার সহিত বলিল—ভাই তোর কি ক্ষতিটাই ক'রলুম, সত্যি এমন বেকুব আমি জীবনে হইনি। তোর ঠিকানাটা দে ভাই, কাল টাকা দিয়ে আসবো।

—থাক্, থাক্, আমার টাকার জন্য এত চিন্তা কেন? না হয় না দিলি, ছাখ্ তোর টাকাগুলো কি হ'লো।

—সত্যিই আমার মন আর টি'কছে না, আটটা পয়সা দেনা ভাই, তাড়াতাড়ি বাসায় যাই।

বন্ধুবর বন্ধুর আসন্ন বিপদে অকাতরে একটি দুয়ানি সাহায্য করিলেন। বগলা বন্ধুর ঠিকানা লইতে ভুল করিয়া ত্বরিতে বাসে উঠিয়া পড়িল।

বেলা দেড়টায় মহোল্লাসে মার্কসল, দুই পয়সার বার্লি ও আটটা বিড়ি সমেত ফিরিয়া বগলা বিপিনকে চপ্ কাটলেটগুলি পকেট হইতে বাহির করিয়া দিল। বিপিন বগলার অপরিমেয় ক্ষমতার পরিমাণ করিতে না পারিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করিল।

ওদিকে বিনোদ তিনটা অবধি উষ্ণ মস্তিষ্কে অনাহারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কোন প্রকার আহার্য্য সংগ্রহের কোন পথ করিতে পারে নাই। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। লাইট-পোষ্ট হেলান দিয়া শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলিল। বিনোদ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে মনস্তত্ব সম্বন্ধে নূতন গবেষণা জানাইল।

সম্মুখেই একটা রেস্তোরাঁ। একটি সৌখীন যুবক আরামে চা ও কিছু খাদ্য অতিশয় তৃপ্তির সহিত ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করিতেছিলেন।

বিনোদ বলিল,—ভদ্রলোকের চপ্ ক'খানা কিন্তু অনায়াসে খেয়ে আসা যায়।

—যা, তোর যত অসম্ভব কথা!

—যদি পারি, কি দিবি? দু'টাকা বাজি।

বন্ধুর সগর্ব্ব বাজির সম্মুখে পরাঙ্মুখ হওয়া আদৌ বীরত্ব নহে, বরং কাপুরুষতার পরিচায়ক। বন্ধু পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া বলিল,—আলবৎ, দু'টাকা বাজি।

বিনোদ দোকানে ঢুকিয়াই হাসিয়া বলিল—কিরে বিষ্টু কেমন আছিস্! অনেকদিন পরে দেখা। একা খেতে নেই,—দে—

বিনোদ ভদ্রলোকের দিকে দৃকপাতও না করিয়া একখানা চপ গালের মধ্যে ফেলিয়া দিল। বলিল—কিরে? কথা ব'লছিস্ নে যে! চিন্‌তে পারিস্ নি? গর্দ্দভচন্দ্র, দমদমায় পিক্‌নিকের কথা ভুলে গেলি? সারা দুপুর স্কুলে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে, তোমার স্মরণ-শক্তি আর কত হবে!

ভদ্রলোক বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া শুধু বিনোদের সশ্মশ্রু মুখখানাই তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিনোদ নিবিষ্ট মনে প্লেটস্থ খাদ্য উদরস্থাৎ করিয়া চলিয়াছে। ভদ্রলোক ক্ষণিক পরে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—আমার নাম তো বিষ্টু নয়।

বিনোদ অধিকতর আন্তরিকতা জানাইয়া বলিল—যা যা আর বোকা-রসিকতা ক'রতে হবে না। বিনোদের স্মরণশক্তি অত খেলো নয়।

বিনোদের আন্তরিকতার কাছে ভদ্রলোকের অস্ফুট প্রতিবাদ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া গেল। প্লেটস্থ খাদ্য নিঃশেষিত হইলে বিনোদ সবিস্ময়ে বলিল—এ্যাঁ আপনার নাম সত্যিই বিষ্টু নয়?

—নয় বলেই তো জানি—

—কিন্তু আপনাকে ঠিক আমার বন্ধুর মতো দেখতে।

বিনোদের বন্ধু সোল্লাসে দু'টি টাকা টেবিলে ফেলিয়া দিয়া বলিল—ধন্যি ছেলেরে বাপ্।

ভদ্রলোক অধিকতর বিস্মিত হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বিনোদ আদ্যোপান্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া বলিল, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'রবেন, যদি কিছু মনে না করেন, আসুন বাজির টাকা সকলেই স্ফূর্তি ক'রে খাই।

ভদ্রলোক রসিকতাটা খুব উপভোগ করিয়াছেন এমনিভাবে বলিলেন—তাতে কি ? আসুন্ না—

বিনোদ বলিল—বেশ, বেশ !

পকেট ভর্তি চপ্ কাটলেট সঙ্গে করিয়া বিনোদ প্রবল উৎসাহে বাড়ী ফিরিল।

আর্সেনিকের মত মার্কসলও ব্যর্থ হইয়া গেল।

স্বরূপার অবস্থা দুইদিনেই এত আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে যে, সে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে সুরু করিল—

চতুর্থ দিনের ভোরে স্বরূপার ছট্‌ফটানিতে জাগিয়া তিনবন্ধু একসঙ্গে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

স্বরূপা বলিল—আমার বুকে ব্যথা হ'য়েছে বিনোদবাবু, নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে।

বিনোদ বিপিনকে ষ্টোভ জ্বালিতে বলিয়া বোতল সাফ্ করিয়া ফেলিল। তাহার পর তিনবন্ধুর সমবেত সেঁকে স্বরূপার বুকের বেদনা সহসা অনেকটা কমিয়া গেল। স্বরূপা বিনোদের হাতখানা ধরিয়া বলিল—বিপিনবাবু, এদিকে আসুন একটা কথা বলি—

তিনবন্ধু স্বরূপার রুগ্নদেহ ঘিরিয়া বসিল। স্বরূপা বলিল—আমি ত' আর সেরে উঠব না, কিন্তু মরবার আগে শুনতে চাই, আপনারা আমাকে ক্ষমা ক'রেছেন কিনা। আপনারা বিশ্বাস করুন, আপনাদের আমি সত্যিই ভালবাসতুম।' আমার মুখে ভালবাসার কথাটা শুনলে আপনাদের হয়তো হাসি পাবে। তা হোক্‌, কিন্তু জীবনে কারও জন্য এতটুকু দুঃখ পাইনি, কেবল আপনাদের জন্য বড় দুঃখ হ'য়েছে। আপনারা যে পোলাও খেয়ে পরদিন উপবাস ক'রেছেন এটাকে অন্যায় ব'লে ভাবতে পারিনি। আমি যে চ'লে গিয়েছিলাম, তার মাঝেও,—আপনারা বিশ্বাস করুন—আমার আর কোন প্রবৃত্তি ছিল না। ম'রেই তো যাবো, আপনাদের কাছে মিথ্যে কথা ব'লে কোন লাভ নেই। আমাকে ক্ষমা ক'রবেন, যে কয়দিন আপনাদের সেবা ক'রবার অধিকার পেয়েছিলাম তারও কতদিন নষ্ট ক'রেছি—কে জান্‌তো আমি এমনি ভাবেই ম'রবো!

হাজার রকমের দুঃখ এবং দুর্দ্দশায় যাদের মুখে সহজে বেদনার ছায়া পড়ে না তাদের মুখও মলিন হইয়া গেল। স্বরূপা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে দু'ফোঁটা অশ্রু শুভ্র গাল বাহিয়া কণ্ঠে আসিয়া পড়িল।

বগলা বলিল—তুমি আজ ম'রবে জেনে কি তোমার দুঃখ হ'চ্ছে স্বরূপা?

রোগিনীর সম্মুখে এমন শ্রীহীন প্রশ্নে বিপিন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। স্বরূপা মলিন হাসিয়া বলিল,—যে মৃত্যু আস্‌ছে, এর চেয়ে ভাল ভাবে ম'রতে আমি পারতুম না, আমি জানি। সে জন্য আমার দুঃখ নেই, কিন্তু যারা অনাহারে থেকেও দুঃখ পায় না, না জানি আমার মৃত্যুতে তারা কতখানি আঘাত পাবে। আপনাদের চোখের জল পড়বে এ আমি ভাবতে পারিনে—

স্বরূপা বিনোদের হাতখানা বুকের মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া চোখের জল উৎসারিত করিয়া দিল।

বগলা বলিল,—ডাক্তার ডাকতে হয়—

বিনোদ বলিল,—কি ক'রে ?...

স্বরূপা জড়িত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইল,—দরকার নেই বগলাবাবু !

স্বরূপার অনুচ্চ প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করিয়া বগলা বলিল, এসো লটারী করা যাক্, যার নাম ওঠে তারই আজ ডাক্তারের টাকা ও খাদ্য যোগাড় ক'রতে হবে।

সকলেই প্রস্তুত হইল। তিনখানা কাগজে নাম লিখিয়া স্বরূপাকে তুলিতে দেওয়া হইল। স্বরূপা হাসিয়া কাগজ তুলিয়া দিল—বিনোদ।

বিনোদ নূতন পাঞ্জাবীটী পরিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণিক ভাবিয়া রহিল। কয়েক টুক্‌রো কাগজে লিখিল নেট দাম কুড়ি, নেট দাম পনর, যথাক্রমে দশ ও পাঁচ টাকা। অনেক নির্জ্জন মুহূর্ত্তের সাধনা ও কল্পনা দিয়া বিনোদ একখানি ছবি আঁকিয়াছিল। ছবিটি কোনও কাগজওয়ালা ছাপিয়া বাহির করিতে রাজি হয় নাই। বাঙলা দেশে সত্যিকার ভাল ছবি মাসিকপত্রে কদাচিৎ ছাপা হয়, এটিও হয় নাই। বিনোদ ছবিখানির উপর দামের লেবেল আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে আসিয়া ছবিখানি রেলিংএ টাঙাইয়া বিনোদ দাঁড়াইয়া রহিল।

নানা জাতির লোক চলিয়াছে পথ দিয়া—কেহ ছবি দেখে, কেহ বা না দেখিয়াই ভীড় অতিক্রম করে। কত স্কুলের ছাত্র ছাত্রী, কেহ দাঁড়াইয়া দেখে, কেহ দেখে না, কেহ বিনোদের মুখখানা দেখিয়া চলিয়া যায়। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমশঃ উষ্ণতর হইয়া উঠে—

বিনোদ পেভমেণ্টের উপরেই বসিয়া পড়ে, আবার উঠিয়া দাঁড়ায়। পা দু'টায় অসম্ভব ব্যথা বোধ হয়, ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন হইয়া আসে। প্রখর রৌদ্রের দিকে তাকানও যায় না। চাহিয়া চাহিয়া দেখে, মোটর চলিয়া যায়, থামে না। আভিজাত্যের আড়ম্বর আসিয়া চোখে লাগে—

এগারোটার সময় উপরের কাগজটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে দাম হইল পনের টাকা। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। বিনোদের মাথার উপরেই রৌদ্র আসিয়া পড়িল, তখন দাম হইল দশ টাকা।

ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল। আফিসের ছুটি হইয়া গেল, ব্যস্ত কেরাণীর দল জিনিষপত্র কিনিয়া ফিরিতে লাগিল, দাম হইল পাঁচ টাকা।

বিনোদ ক্লান্তিতে অবসন্ন। রেলিংএ ভর দিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুজিল। একজন মেমসাহেব পাশ দিয়া গেলেন, গাউনের সুবাসে বিনোদ সচেতন হইয়া দেখিল, শুভ্র কান্তি, একটি মেয়ে চলিয়া যাইতেছে,—যাক। সারাদিনে অমন কত গিয়াছে। মুখখানি ওর তারুণ্যে ভরা, আনন্দের উচ্ছল নির্ঝর।

বিনোদ আবার চোখ বুজিল। আবার তেমনি একটু সুবাস, সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের 'হ্যালো—'

বিনোদ মাথা নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই তরুণীটি হয়তো ফিরিয়া যাইতেছে।

—স্টিল ষ্ট্যান্ডিং ?

বিনোদ বলিল—ইয়েস্, ম্যাডাম, নো অলটারনেটিভ্।

—লেট্ মি হ্যাভ্ ইট।

নগদ পাঁচটি টাকা, বিনোদের চোখের সামনে ঝিলমিল করিয়া উঠিল। সামনেই ডালপুরীর দোকান, বিনোদ ঢুকিয়া পড়িল তাহার মধ্যে। ডাক্তারের ভিজিট অন্যূন চারি টাকা। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিনোদ ডাক্তার সহ ব্যারাকে ফিরিল।

ডাক্তার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সখেদে বলিলেন, আন্‌হেল্‌দি প্রেস্—

ডাক্তার স্টেথিস্‌কোপ দিয়া স্বরূপার অচৈতন্ত রুগ্ন দেহ পরীক্ষা করিয়া, ওষ্ঠ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—নিউমোনিয়া।

প্রেসক্রিপ্‌সন্ করিয়া দিলেন। ঔষধ ও অন্তান্ত সরঞ্জামের দাম একুনে সাতটাকা দশ আনা।

ডাক্তার ফাউণ্টেন পেন পকেটে ফেলিয়া বিদায় লইলেন। বিনোদ বলিল—এই নাও ডালপুরী, কাল ওষুধ তুমি আনবে বগলা।

বগলা বলিল—তথাস্তু।

স্বরূপার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলপ্ত হয় নাই। সে আবার একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাইল—বগলাবাবু, কি হবে ওষুধ দিয়ে?

বগলা বলিল—মরার আগে খাওয়ার নিয়ম আছে, যদি নিতান্তই না ম'রতে পারো তা হ'লে ওষুধে বেঁচে যাবে। আমরা এমনি ক'রেই বাঁচি কি না!

পরদিন সমস্ত বাক্স ঝাড়িয়া বগলা একখানা উপন্তাসের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশক-সংগ্রহে অভিযান করিল।

প্রকাণ্ড দোকান, সম্মুখেই বিরাট টেবিলে বিপুল স্বত্বাধিকারী আসীন। বগলা বিনয়ে অর্দ্ধ দণ্ডবৎ হইয়া বলিল—মশাই একখানা উপন্তাসের কপিরাইট বিক্রি—

স্বত্বাধিকারী দরজাটা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—এখন যান, বড্ডো বিজি, আর আমরা বাইরের লেখকের বই নিই নি।

বগলা রাস্তায় বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিল, লেখকদিগকে আবার ঘর ও বাহির দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে নাকি! হয়তো হইয়া থাকিবে, কথাটির ব্যুৎপত্তি এবং উৎপত্তি চিন্তা করিতে করিতে ভাবিল, যাহারা বিবাহিত তাহাদের ঘর ও বাহির থাকে, তবে আমরা যদি

বৈঠকখানায় আশ্রয় লাভ করি তবে অন্দরস্থ কাহারা? বগলা সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিল,—বোধহয় ইনি লেখিকা ছাড়া লেখকের পুস্তক প্রকাশ করেন না! নিশ্চয়ই তাই!

আর একটি দোকান, ক্ষুদ্র প্রকাশকের। ক্ষুদ্র বার্ণিশ-করা একটি স্বত্বাধিকারী। বগলা বিনীত নমস্কার জানাইল—

—কি চাই?

—একখানা উপন্যাসের কপিরাইট-বিক্রী ক'রতে চাই, পাণ্ডুলিপি সঙ্গেই আছে।

—বসুন, আপনার নাম?

—বগলারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

—আপনার নাম ত শুনিনি, ক'দিন লিখছেন, কোনও কাগজে—

—হ্যাঁ, মঞ্জরী, মর্ম্মর, মৃন্ময়ী প্রভৃতিতে লিখেছি।

স্বত্বাধিকারী চিন্তাযুক্ত হইয়া পেন্‌সিল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন—বগলা, বগলা, একটু যেন মনে পড়েছে। আচ্ছা কপি রেখে যান, পড়ে দেখি, তারপর যা হয়—

বগলা চেয়ারটার উপর বসিয়া বলিল—টাকাটা আমার আজই দরকার। আমার লেখা যদি পড়ে থাকেন, সেই যথেষ্ট, কপি পড়বার দরকার নেই।

—দরকার আছে বৈকি? না পড়লে কি ক'রে বুঝবো কি নিচ্ছি।

—আপনি কি লেখেন?

—না।

—তা হ'লে পড়ে তো বুঝবেন না।

স্বত্বাধিকারী তাহার সম্মুখেই এমন অসম্মানকর বাক্য শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—তবে যান মশাই, বিরক্ত ক'রবেন না। কত লেখক মানুষ ক'রে দিলুম!

বগলা বিনীত ভাবে বলিল,—সে কথা হয়ত সত্যি। তবে আপনি ব্যবসার দিকটা যে পরিমাণে বোঝেন; সাহিত্য হয়তো ঠিক ততটুকু নাও বুঝতে পারেন।

—যান্ মশাই, কাজের সময়! বই বাজারে না চ'ল্‌লে আমরা নিয়ে কি লোকসান দেব?

বিফল-মনোরথ বগলা রাস্তায় চলিতে চলিতে ভাবিল: মানুষ যত বড় হয় তাহার অভিজ্ঞতাও তত বাড়ে। বই লিখিলেই হয় না, নূতন ভাবে চিন্তা করিলেই হয় না, আর্টের উৎকর্ষ-সাধন করিলেও হয় না, বই বাজারে চলিবার উপযোগী হওয়া চাই। বাজারে চলাটাই তাহার বড় প্রয়োজন। বগলা প্রতিজ্ঞা করিল, এমন বেকুবের মত কথা সে আর বলিবে না।

ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা প্রায় শেষ হইল,—উদরে দুরন্ত ক্ষুধা, চরণে অবসাদ, অন্তরে দুর্দ্দম ব্যস্ততা।

রেলওয়ে সিরিজ—মূল্য প্রতিখণ্ড আট আনা। ভিতরে ভিতরে পাঁচ আনাতেও বিক্রী হয়। স্বত্বাধিকারী একটি শুভ্র কেশবিরল বৃদ্ধ।

বগলা সবিনয়ে তাহার স্থূল বক্তব্য মোটামুটি শেষ করিয়া কহিল—সারাদিন দোরে দোরে ঘুরেছি, এখন এমন অবস্থা দশটাকা পেলেও দিয়ে যাই।

বৃদ্ধ বলিলেন—বসুন, না পড়ে তো বই নেওয়া যায় না, তবে যখন ব'লছেন দু'চারখানা কাগজে লিখেছেন, তখন চলনসইও হ'তে পারে। হ্যাঁ মশাই প্রেম-ট্রেম আছে তো? তা না হ'লে জানেন তো বাজারে চলে না।

বগলা দেখিল, তাহার উপন্যাসে নারীর নামও নাই, তবুও তৎক্ষণাৎ বলিল—নইলে কি আর বই হয় মশাই—

বৃদ্ধ চুপি চুপি বলিলেন,—বাঙলার অবস্থা ত জানেন, বয়স যাদের পঁচিশের উপর তারা ত পড়ার সময় পায় না, কেরাণীগিরি করে। ভাগ্যিস্ ছেলে মেয়েদের দু'চারটে স্কুল কলেজ হ'য়েছে, বড়লোক বাপের অর্থ কিছু অপব্যয় হ'চ্ছে, নইলে কি ক'রে খেতুম তাই ভেবে কাঠ হ'য়ে যাই।······

অধিকতর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, মেয়েদের বিরুদ্ধে কিছু লেখেন নি ত?

—রামচন্দ্র! একালে কি তাই লেখা যায়?

—মেয়েদের ত্যাগ, সতীত্ব, একনিষ্ঠ প্রেম, সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা আছে তো?

—প্রত্যেকটী বিষয়ে দুপৃষ্ঠা।

বৃদ্ধ জেরায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, নিন্ মশাই, আট টাকা, না পড়েই নিলুম। বেনামে দিতে আপত্তি নেই ত? একটা মেয়ের নামে, ধরুন মঞ্জুলিকা সেন, জানেন ত মেয়েদের বই একটু বেশী কাটে।

বগলা টাকা কয়েকটা বাজাইয়া চার পয়সার ষ্ট্যাম্পে নাম দস্তখত করিয়া দিয়া বলিল,—আদৌ না।

বগলা সগর্ব্ব পদক্ষেপে রাস্তায় আসিয়া দেখে ঘর্ম্মাক্ত পশ্চিমা ব্রাহ্মণ পুরী ভাজিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বগলা নিমেষে দোকানে প্রবেশ করিল। এইবার স্বরূপার জীবনের কপিরাইট কোনমতে বাঁচান যায় কিনা তাহাই দেখিতে হইবে!

পরিপূর্ণ পাকস্থলীর প্রভাবে অন্তরের পূর্ণতা প্রাপ্তিও স্বাভাবিক কিন্তু বগলা দোকান হইতে বাহিরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সমস্ত রাস্তায়, সমস্ত পৃথিবীতে যেন ম্লানিমা দেখা দিয়াছে। দিনের নৃত্য যেন সহসা বেতালে চলিতে সুরু করিয়াছে, বাস ট্রামও যেন চলিতেছে কোনমতে না-চলার মত। গাছের সবুজ পাতাগুলা যেন সহসা মাঘের শেষের শীতক্লিষ্ট

পাতার মত ফিকে হইয়া গিয়াছে। আকাশের গায়ে শাদা মেঘের সারি, পুঞ্জীভূত বেদনার মত স্তূপীকৃত হইয়া আছে। তাহার মাঝে পূরবীর মত করুণ বুকফাটা ক্রন্দনের কলকল্লোল হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। কে যেন আসে নাই, কে যেন চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে, এমনি একটা সর্ব্বহারা শূন্যতা যেন আকাশে বাতাসে মিশিয়া রহিয়াছে। এক জোড়া সুন্দর সজল আঁখির কোণে যেন অশ্রু টলটল করিতেছে, একটু হাওয়ায়, একটী দীর্ঘনিশ্বাসেই যেন নব যমুনার সৃষ্টি হইবে।

চারিদিকের ম্লানিমা বগলার অশান্ত অন্তরে উদ্দাম উৎকণ্ঠার জলাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া দিল। দ্রুতপায়ে ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া বাসার দিকে চলিতে সুরু করিল। এই পথটুকু তাহার কাছে আজ অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল······

······এক একটা সিঁড়ি যেন অনধিগম্য, পায়ে দ্বিগুণ শক্তি লাগে। ওই ঘরটা—পরিচিত কুঠুরী······

দরজা ঠেলিয়া দেখে—স্বরূপার স্তব্ধ, শান্ত, সমাহিত, সুস্নিগ্ধ মুখখানি সদ্যস্নাত শেফালির মত আঙিনায় ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে জীবনের কোন চিহ্ন নাই। অযত্ন-রুক্ষ কেশপাশ বিশৃঙ্খল, হয়ত মৃত্যুযন্ত্রণায় স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে। চোখের কোণ হইতে দু'টি সুস্পষ্ট শুষ্ক জলধারা চিবুকে আসিয়া থামিয়াছে—হয়ত একটু আগেও জলটুকু টলটল করিতেছিল। হাতের আঙুলগুলি শাদা হইয়া গিয়াছে, কপালে একটু সিন্দুর—স্বরূপা নিঃসন্দেহে মহাপ্রয়াণ করিয়াছে—

বিপিন ভাঙা বেহালায় প্রাণপণ নৈপুণ্যে বুকের ক্রন্দনকে সুরের রূপ দিয়া ঢালিয়া দিতেছে, অস্ফুট রাগিণী উঠিয়াছে মূলতান—আমি পথের সম্বল হারালাম। চোখ দু'টি মুদিত, বাহিরের শব্দ স্পর্শের প্রবেশ সে স্বপ্নরাজ্যে নিষিদ্ধ।

বিনোদের চোখে অশ্রু টলমল করিতেছে, তাহার ফাঁক দিয়া কিছুই দেখা যায় না, শুধু ঝাপ্সা কুহেলি, তবুও তুলি চালনায় বিরাম নাই, আলস্য নাই। যে তরুণীর সুন্দর মুখশ্রী গত সাতদিনের শ্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অন্ধের তুলি চালনায় সেই মুখখানার উপরই একটি কালো ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, ছবিখানা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বিনোদ তবুও রঙের প্রলেপ দিয়া যাইতেছে।

বগলার অবাধ্য হাত হইতে ঔষধের বাক্স ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। সহসা হাত দোলাইয়া বলিল,—এমন ক'রে ম'রে যাওয়া! এর কোন মানে হয়!

বিনোদ চোখ দু'টি মুছিয়া বলিল,—যাবার সময়, আমাকে বিপিনকে তার শেষ চুম্বন দিয়ে গেছে, তোকে তার শেষ চুম্বন জানাতে ব'লে গেছে। ব'লেছে, ব'লবেন—আমি মরার সময় ভগবানকে ডাকিনি, আমার জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা আমি মাথা পেতে নেব, আপনাদের জন্যই তার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—

বগলা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—ভুল ক'রেছে, ততক্ষণ অন্য কিছু ক'রলে পারতো।

বিপিন স্বরূপার মাথাটায় হাত দিয়া বলিল—ভাই, মুখখানা ভালই ব'লতে হবে, না? একটু আগেও ত জীবন্ত ছিল, কি হ'ল?

এ প্রশ্নের সরল উত্তর বিপিন জানিত—চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। তবুও এই কথাটা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

অনেকক্ষণ পরে বগলা বলিল,—সৎকারের ব্যবস্থা ক'রতে হবে ত?

বিনোদ বলিল—সৎকারের খরচ পাঁচ টাকা—নয়? ওষুধ ফেরৎ নেয় কিনা দেখ।

বগলা অনতিবিলম্বে আবার বাহির হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন অতি ধীর মন্থরগতিতে নামিয়া আসিতেছিল। বগলার পা আর চলিতে চাহে না, পায়ে পায়ে জড়াইয়া আসে।

ডাক্তারখানার কেসিয়ার বিপুল ঘন কৃষ্ণগুম্ফে মোচড় দিয়া বলিলেন, —ক্যাসমেমো কাটা হ'য়ে গেছে মশাই, আর কি ফেরৎ হয়।

বগলার বাদানুবাদ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না, রাস্তায় ঔষধগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কতক ভাঙিয়া গেল,—সে সেদিকে ফিরিয়াও দেখিল না। চলিতে লাগিল—রাস্তাটা বারে বারেই ভুল হইয়া যায়, বগলা তবুও থামে না।

বিনোদ বলিল,—এস আমরা বিগত বন্ধুর একটা স্মৃতি একান্ত আপনার ক'রে রাখি—ওর একখানা ছবি আঁকি। সকলেই প্রস্তাব অনুমোদন করিল। ছবি অঙ্কন সুরু হইল বটে কিন্তু এলিফ্যাণ্ট পেপার নাই। একখানা অর্দ্ধসমাপ্ত ছবির উপরেই শিল্পীর রেখায় রেখায় মৃতের মুখশ্রী ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বিপিন আর বগলা অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিনোদের হাতখানা দ্রুত চলিয়াছে, লণ্ঠনের আব্‌ছা আলোকে ফুটিয়া রহিয়াছে শিশির স্নিগ্ধ নিদ্রিত একটি পদ্মপাতা —মৃত স্বরূপার নিস্পন্দন মুখখানা।

ধীরে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষ। নিশীথ রাত্রে ঘরের মাঝে এক ঝলক শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল, জানালা দিয়া তেমনি শুভ্র একটু জ্যোৎস্নার প্রফুল্লপ্লাবন স্বরূপার মুখের উপর। রাস্তায় ব্যস্ত গাড়ীঘোড়ার চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে নিবিড় নিস্তব্ধতা—সম্মুখের পাকুড় গাছের দু'একটি পাতা ঝিরঝির করিয়া নড়িতেছে।

বগলা ছবির একটা স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিল—বিনোদ, গালের টোলটা ঠিক হয়নি, আর ওপরের ঠোঁটখানি ছাখ না কেমন পাতলা।

বিনোদের তুলি চালনা ক্ষণিকের জন্ম থামিয়া আবার চলিল, রেখায় রেখায় প্রাণপণ নৈপুণ্যে সে মুখশ্রী ফুটাইতে লাগিল। কিন্তু যেমনটি পাশে, এমনটি আর হয় না। রং অনেক ফুরাইয়া গিয়াছে, সব রং নাই, তা হোক্।

কোন এক বড় লোকের বাড়ীর সুবৃহৎ ঘড়িতে এক, দুই, তিনটাও বাজিয়া গেল। বিপিন বলিল,—এই আঙুলটা ঠিক হয় নি—

অতি ধীরে সন্তর্পণে পৃথিবীর উপর কাহার যেন চরণ স্পর্শ পড়িতে চাহিল। সে এক বিরাট বেদনা—গাঢ়, দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসের অতি মৃদু নিষ্কাষণের আঘাতে বকুলের ঝরিয়া পড়া, শিশুর ব্যথাতুর মুখের মত করুণ। বিরহীর কণ্ঠভেদী বিরহ সঙ্গীত—আলোর প্রকাশে যাহার কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হইয়া যায়, সে যেন পাষাণ প্রাচীরের অন্তরে বালিকা বধূর অস্ফুট ক্রন্দন। সমুদ্র-সৈকতে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের ব্যর্থ ভাঙিয়া পড়া—মৃতের বুকের উপর অশ্রুবর্ষণ—বালবিধবার অর্থহীন অবগুণ্ঠন।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল তিনটি পাষাণ হৃদয় চিরিয়া তিনটি অশ্রু-নির্ঝর,—ক্রমে আসিয়া মিশিয়াছে একই নদীতে; তাহারই মাঝে যেন শতদলের মুখে চুম্বন করিয়া ফিরিতেছে উন্মাদ তরঙ্গের দল, কিন্তু এই এত আকুল চুম্বনে ওর যেন কোন উত্তেজনা নেই, শতদল শুধু ফুটিয়াই আছে, জড়ের মত। শিল্পীর অন্তরের ক্রন্দন, রঙের ক্রন্দন, রেখার ক্রন্দন গোপন নিশীথের অন্তরালে রূপ লইয়াছে—ফুটিয়াছে স্বরূপার স্বরূপ।

বিপিনের একখানা ডায়রী বই ছিল।

ডায়রির বয়স পাঁচবৎসর হইবে,—কতকগুলি রাস্তার নাম মাত্র অতি সযত্নে তাহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার কতকগুলির নীচে লাল কালির দাগ। অর্থ এই—এই সমস্ত রাস্তা দিয়া যাতায়াত নিষিদ্ধ। ঐ সমস্ত গলিস্থ মেসের বন্ধুগণের নিকট হইতে যথা সময়ে কিছু কিছু অর্থ ধার করা হইয়াছিল কিন্তু অদ্যাবধি তাহা শোধ দেওয়া হয় নাই।

স্বরূপার সৎকার করিতে লাগিবে পাঁচটাকা,—এই টাকা সংগ্রহ করিবার ভার পড়িয়াছে তাহার উপর। হাওলাৎ বিষয়ে বিপিনের মস্তিষ্ক উর্ব্বর, একসঙ্গে পাঁচটাকা চাহিলে কেহই দিবে না, সে কথা সে ভাল করিয়াই জানে। আট আনা চার আনা করিয়া যখন সে পাঁচটাকা সংগ্রহ করিল তখন বেলা দশটা।

স্বরূপার সৎকার শেষ করিয়া তাহারা যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আহার্য্য কিছু ছিল না, তাহা সংগ্রহ করিবার মত উদ্যম বা মানসিক অবস্থাও ছিল না। তাহারা ক্লান্তদেহে শুইয়া পড়িল—বগলা শুইয়া শুইয়া ভাবিল—শ্মশানে অমনি আর একটী মেয়ের মৃতদেহকেও দাহ করিবার জন্য আনা হইয়াছিল। মৃত সেই তরুণীর রোগপাণ্ডুর মুখেও যেন একটা আভিজাত্যের প্রলেপ দেওয়া, চারিপাশে তার ফুলের তোড়া। ফুলের মাঝে সিন্দুর-লিপ্ত মুখখানা তার ফুলের মতই স্থির হইয়া রহিয়াছে। চারিপাশে রোরুদ্যমান আত্মীয়, স্বজন বন্ধু! পাশেই স্বরূপার শুষ্ক ক্ষীণ দেহ, নিষ্প্রাণ খাটিয়ার অনাড়ম্বর শয্যায় চিরনিদ্রাগত, পাশে দাঁড়াইয়া তিনটি প্রাণী, অনাহারে অত্যাচারে শীর্ণ, ম্রিয়মাণ—যাদের অশ্রুর উৎস বহুদিন শুকাইয়া গিয়াছে,—চোখের জল ফেলিতে হাসি

পায় ! এই মৃত্যু, এই দাহের মাঝেও একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা আড়ম্বর যেন আভিজাত্যের প্রাচীর লইয়া চিরদিন তাহাদিগকে দূর করিয়া রাখিয়াছে।

স্বরূপার মৃত্যুতে অন্তরে তাহারা যে শোক, যে দুঃখ ভোগ করিয়াছে তাহা ত অল্প নয়, বুকের অন্তঃস্থলও প্রতিমুহূর্ত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, বুকের শিরায় অব্যক্ত একটা যাতনা যেন তাহাদিগকে বিবশ করিয়া দিয়াছিল, তবুও অশ্রুর বিলাস তাহাদের কাছে হাস্যকর বলিয়াই মনে হইয়াছে।

সকালে উঠিয়া তিন বন্ধু পরস্পরের পানে নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া ছিল।

জীবনের একটা অঙ্ক অভিনয় হইয়া গিয়াছে মাত্র, নতুন করিয়া আবার জীবন আরম্ভ করিতে হইবে, সেকথা তাহারা ভাল করিয়াই জানিত অতীতকে স্মরণ করিয়া কষ্ট ভোগ করিবার কোন সার্থকতা নাই, তাহাও তাহারা জানিত কিন্তু তবুও গত কালের স্মৃতি তাহাদের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া যেন বাসা বাঁধিয়াছিল। কিছুতেই সেগুলি যেন যাইতে চায় না—

অভুক্ত অবস্থায় গাঢ় নিদ্রা সম্ভব নয়, রাত্রে কাহারও সুনিদ্রা হয় নাই। নানা প্রকার স্বপ্নে সারারাত্রি অস্বস্তিতে কাটিয়াছে। বিপিন স্বপ্ন দেখিয়াছে—বিরাট উঁচু এক বাড়ী, সে যেন মই দিয়া তাহার উপরে উঠিতেছে, মাঝামাঝি যাইতেই ঘূর্ণি হাওয়া আসিয়া তাহাকে শূন্যে ছুঁড়িয়া দিল, বিরাট শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নিরাশ্রয় বিপিন তীব্র বেগে নীচে পড়িতেছে, আর একটু হইলেই ভূপৃষ্ঠে আহত হইয়া তাহার দেহ চূর্ণ হইয়া যাইবে—বিপিন চমকাইয়া জাগিয়া গেল।

বগলা দেখিয়াছে—কাওসাভরা ময়ানদী,—ওপারে সবুজ ঘাসে ভরা ময়ানদীর চর। শুভ্র একটি পায়ে-চলা পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামে

গিয়াছে। এপারে এক বাবলা গাছের তলায় বসিয়া বগলা বাঁশী বাজায় —নিত্য এই পথে শূন্যকুম্ভকক্ষে আসে একটি পল্লীবধূ। অস্তমিতপ্রায় সূর্য্য ও বগলার পানে চাহিয়া নির্ব্বাক দৃষ্টিতে সে কি যেন বলিতে চায়। বলা হয় না, সে ফিরিয়া যায়—কলমি ফুল ও শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে ডাহুক ফড়িং খুঁজিয়া ফিরে, বগলা ফিরিয়া আসে, শোকার্ত্ত ব্যথিতের মত ক্লান্ত ধীর পদক্ষেপে—

বগলা চাহিয়া দেখে হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বিনোদ বসিয়া আছে, তাহার শুষ্ক চোখের প্রান্ত বাহিয়া এক ফোঁটা অশ্রু ধীর নিঃশব্দে গড়াইয়া পড়িতেছে, বিনোদ চাহিয়া আছে একটুকরা কাগজের পানে। সমস্ত রাত্রির পরিশ্রমে, তিন বন্ধুর বেদনা ব্যাকুল আগ্রহের মাঝে যে ছবিখানি ধীরে ধীরে রূপ লইয়াছিল, যাহার মাঝে বিগত বন্ধুর স্মৃতিকে তাহারা এই মর জগতের মধ্যে আপনার করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল—তিনটি অশ্রু-নির্ঝরের সঙ্গমে রক্তোৎপলটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কাহার এতটুকু অসতর্কতায় ঘন ম্যাণ্ডারিণ ব্ল্যাকের অন্তরালে চিরদিনের মত অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই নশ্বর স্বরূপার অবিনশ্বর স্মৃতি আজ কালির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে—তাই বিনোদের গাল বাহিয়া এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে!

বগলা একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—যা কালের অন্তরালে গেছে, তা কালিরও অন্তরালে থাক, তাহলেই ও মনের অন্তরালে যাবে—

বিনোদ ছবিখানার পানে আর একবার চাহিয়া দেখিল,—কোন জবাব দিল না।

দরজায় ঠক্‌ঠক্ করিয়া কড়ার শব্দ হইল—

বগলা দরজা খুলিয়া দেখে, ময়লা সার্টের উপর একটা পরিষ্কার চাদর

গলায় দিয়া এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। বগলা বলিল,—কাকে চান ?

—বিনোদবাবু থাকেন এখানে ?

বগলা ইঙ্গিতে বিনোদকে দেখাইয়া দিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল।

আগন্তুক বিনোদের পায়ের কাছে দণ্ডবৎ হইয়া বলিল,—আঃ বাঁচলাম ছোটবাবু! আজ পাঁচদিন পেটে গামছা বেঁধে ক'লকাতার শহরে ঘুরছি; অবশেষে আজ আপনাকে পেয়েছি!

বিনোদ বিস্মিত হইয়া বলিল,—একি, বিহারী কাকা! তা আমার জন্য এত পণ্ডশ্রম কেন ?

বিহারী বিলাপের সুরে বলিল,—সে কথা আর কি বলবো ছোটবাবু, মা আজ ক'দিন মৃত্যু শয্যায় পড়ে কেবল 'বিনু' 'বিনু' বলে সারা হ'চ্ছেন। প্রাণ তার কিছুতেই যেন বেরুচ্ছে না,—কেবল ব'লছেন, বিনুকে সংসারী দেখে না ম'রলে আমার শান্তি নেই—

বিনোদের গৃহত্যাগের অনেক ইতিহাস ছিল, সেগুলি এলোমেলোভাবে তাহার মনে পড়ায় মনটা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে বলিল—তা এতদিন পরে, মা'র আমাকে সংসারী ক'রার বদ খেয়াল কেন? এ ছাড়াও তিনি অনেক কিছুই ত ক'রতে পারতেন—

বিহারী বলিল,—সেই কথাই তিনি ত বলেন, বিনুকে আমার শান্তির সঙ্গে বিয়ে দিলাম না, তাই বিনু দেশান্তরী হ'ল—এ দুর্মতি কেন আমার হ'লো—

পুঞ্জীভূত অভিমান ও ক্রোধের সহসা যেন বিস্ফোরণ হইল—আমি সে জন্য দেশান্তরী হয়নি, হ'য়েছি তোমাদের মত শেয়াল কুকুরের জন্য, যাদের অপব্যাখ্যা অপমানের চেয়েও ক্লেশকর।

বিহারী বিষয়ীলোক, সে জানিত এরূপ অবস্থায় কোন ফল হইবে না।

অনেক আলাপ করিয়া সে শেষে তাহার শেষ বক্তব্য জানাইল,—আজ রাত্রের গাড়ীতেই যাইতে হইবে।

বিনোদ বলিল,—ফিরে যাবার জন্ত আমি চলে আসিনি, মাকে ব'লো আমি মারা গেছি, তাহ'লেই তার আর মৃত্যুর কোন অন্তরায় থাকবে না।

কথাটার মধ্যে যে অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া ছিল সে কথা বিহারীও বুঝিল, সে বলিল—আপনাদের নুন খেয়েই না জীবনে বেঁচে আছি, আমি চর্ম্ম চক্ষে দেখ্‌ছি আপনি বেঁচে আছেন, আমি মার কাছে কেমন ক'রে মিথ্যা বলবো? এ অবস্থায় না গেলে কি চলে?

তিনদিন তিনরাত্রি ধরিয়া বিনোদ ও বিহারীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিল। বিহারীর ধৈর্য্য অসীম, অপমানে তিরস্কারে ব্যর্থতায় তাকে এক বিন্দুও বিচলিত করিতে পারে না। বিনোদ অপমান করিলে সে হাসিয়া বলে,—ছোটবাবু আপনার গালাগাল আমার আশীর্ব্বাদ, আপনি মারুন-ধরুন যাই করুন, আপনাকে না নিয়ে আমি কিছুতেই যাব না।

বাইশ বছর ধরিয়া সে এই বিনোদদের পরিবারে গোমস্তার কাজ করিয়াছে, সে ছোটবাবুর মেজাজের সবখানিই চিনিত। সে একদিন বলিল,—শান্তি দিদিও তাই সেদিন মাকে ব'লছিলেন, যেমন ক'রেই হোক এবার তাকে সংসারী করাই দরকার—

বিনোদ বিমনা হইয়া ভাবিল,—এই শান্তিই একদিন কাহার অন্তরে শতদলের গন্ধ লইয়া ফুটিয়াছিল, অতীত তাহার শতবাহু মেলিয়া যেন বিনোদকে আকর্ষণ করিতেছে—বিনোদ বিহারীকে বাধা দেয় আর অতীতের দিনগুলি তাহার কাছে স্পষ্টতর হইয়া উঠে—

অবশেষে বিনোদেরই পরাজয় হইল। বিনোদ যাইতে স্বীকার করিল।

স্নটকেসে কাগজ, তুলি, কম্পাস বোঝাই করিয়া বিহারীকাকা প্রস্তুত হইল, বিনোদও ছোট পুঁটুলি লইয়া দরজার পাশে বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইবার জন্যে দাঁড়াইল। বিনোদ থামিয়া বলিল,—কয়েকদিনের জন্য যাচ্ছি ভাই'; বনের পাখী, খাঁচায় মন ব'সবে না। আবার ফিরে আস্‌বো—

বিপিন বলিল,—গিয়ে পত্র দিস্‌, তোর জীবনের পরিণতি কি হ'ল তা অন্ততঃ জানা দরকার!

বিনোদ হাসিয়া জানাইল সে পত্র দিবে। বগলাকে বলিল,—তা হ'লে যাই ভাই—

বগলা বলিল,—যাদের যাওয়ার জায়গা আছে তারা যায়ই, তার জন্ত দুঃখের কিছু নেই—

দুই বন্ধু দরজায় দাঁড়াইয়া অপস্রিয়মান বিনোদের দেহের পানে চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বগলা পুনরায় বলিল,—যাদের যাওয়ার জায়গা থাকে তারা যায়ই, তার জন্য দুঃখ কি?

শরতের প্রথম শিশির সবেমাত্র ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকাল বেলায় সোনালী রৌদ্রে নূতন ধানের মঞ্জরী চিক্‌মিক্‌ করিতেছে,—পাতায় শিশির ফোঁটা অশ্রু বিন্দুর মত টলমল করিয়া কখন হয়ত ঝরিয়া পড়িবে। বাবলা গাছে কোন এক সঙ্গীহারা ঘুঘু ডাকিয়া ডাকিয়া তীরভূমি ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। চারি পাশের বর্ষাক্রান্ত পৃথিবী মৃত্যুর মত স্থির নিঃশব্দ। শ্লথ মন্থর নদীস্রোতে দেহ এলাইয়া দিয়া বিনোদের নৌকাখানি চলিয়াছে—দুই তীর অতীতের শত ছিন্ন স্মৃতি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিগত নয় বৎসরের ক্রম-পরিবর্ত্তন পুঞ্জীভূত হইয়া বিনোদের চোখে ধরা দিল। তীরে একটা কলমিফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার উপরে তীরে

কয়াফুলের ঝোপ। বিনোদ বিহারীকে বলিল,—এই কেয়াবনে আমি আর জীবন কত কেয়াফুল পেড়েছি—জীবন কোথায়?

—বাড়ীতেই আছে, তার দুই ছেলে এক মেয়ে—

—ওই আম গাছ থেকে দুর্গাদাস একদিন পড়ে গিয়েছিল—

—ওঃ অল্প বয়সে বৌকে বিধবা ক'রে দুর্গা আজ দুই বৎসর মারা গেছে, বৌটির কি দুর্গতি—

বিনোদের মনটা বাল্যবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে সহসা ব্যথিত হইয়া উঠিল। একটা ক্ষুদ্র মৃদু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে চুপ করিল।

খালের ধারের আমবাগানে বাল্যকালে বিনোদ কত আম কুড়াইয়াছে। আমবাগানের পাশ দিয়া নৌকা ঘাটে আসিয়া ভিড়িল।

সর্ব্বপ্রথমে আসিল একদল দিগম্বর বালক বালিকা, কৌতুক দৃষ্টিতে আগন্তুক বিনোদের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। বিনোদ মুখগুলি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও কাহাকে চিনিতে পারিল না। অদূরে গৃহের অন্তরালে গৃহবধূগণের সপ্রতিভ যুগ্ম আঁখিগুলি কৌতুকভরে তাহারই মুখের পানে চাহিয়া আছে—অবগুণ্ঠনের ফাঁকে তাহারা চাহিয়া দেখিতেছে। বিনোদের মা সুস্থ দেহে ঘাটে আসিয়া বলিলেন—বাবা বিনু এসেছিস্—আয়—

বহুদিন পরে পুত্রকে পাইয়া আনন্দে তাঁহার চোখ দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল। পাড়ার রাঙাঠাকুমা আসিয়া বলিলেন,—বিনুদাদা এলে, এবার রাঙা টুক্‌টুকে একটী নাতবৌ না আন্‌লে আর চ'লছে না—এবার আর সতীনের ভয় ক'রছি না।

বিনোদ নির্ব্বাক বিস্ময়ে বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে একবার চোখ বুলাইয়া লইল—তাহারা যে ঘরে পড়িত সেই ঘরের ভিটায় আজ শশার মাচায় প্রকাণ্ড এক পাকা শশা ঝুলিতেছে। এই অতি দীর্ঘ নয় বৎসরের বিন্দু

কিন্দু পরিবর্ত্তন সমগ্রভাবে বিনোদের চোখে অতি নূতন বলিয়া মনে হইল। যে ঘরটি যেমন ছিল তেমনটি আর নাই, কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কতক একেবারেই নাই।

বাড়ীর সকলের সহিত দেখা করিয়া বিনোদ পাড়ার দিকে রওনা হইল,—পাশের বাড়ীর উঠানে বিরাটগুম্ফ একটি যুবক ছেলে কোলে করিয়া পায়চারী করিতেছে। এ অনিল,—বাল্যকালে বিনোদ কারণে অকারণে তাহার কত কান মলিয়াছে,—আজ সে পিতা! বিনোদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। খুড়ীমা ডাকিয়া বলিলেন,—বিনু, অনিলের ছেলে দেখেছিস্,—ও তুই ত বৌও দেখিস্ নি, সে ত আজকার কথা নয়—বৌমা এদিকে এস ত।

বিগত-যৌবনা একটি বধূ আসিয়া দাঁড়াইলেন। খুড়ীমা তাহার অবগুণ্ঠন স্বল্প উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—এই অনিলের বৌ, প্রণাম কর বৌমা—

খুড়িমার দাওয়ায় বসিয়া বিনোদ তাঁহার দীর্ঘ একঘেয়ে সুখ দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—আসি খুড়ীমা, আবার আস্‌বো—

রাস্তার ধারেই শেফালি ফুলের গাছ। শারদ প্রভাতে এইখানে বসিয়া শান্তি ফুল কুড়াইত। পথের পার্শ্বে শ্যামল ঘাসের গালিচার উপর ফুলের যেন প্রলেপ দেওয়া থাকিত। কিশোরী শান্তি গাছে ঝাঁকি দিয়া ফুল ফেলিতে অনুরোধ করিত—

মুখুজ্যেদের উঠানে প্রকাণ্ড বকুল গাছ,—এর মালা গাঁথিয়া শান্তি উপহার দিয়াছে। আজও তার ফুল ঝরিয়া পড়ে, গ্রামের কিশোরীরা আজও তাহা কুড়াইয়া মালা গাঁথে। এই গ্রাম, এর প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি

বৃক্ষপত্রে, প্রতি ধূলিকণায় অতীতের স্মৃতি আজও শিশির বিন্দু—অশ্রুবিন্দুর মত টলমল করিতেছে—এ তার অতি আপনার, অতি প্রিয়, অতি অন্তরতম।

শান্তি প্রণাম করিয়া বলিল,—এই যে বিনুদা তুমি সত্যিই এসেছ?

শান্তির মুখের দিকে বিনোদ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল,—এই শান্তির অন্তরস্পর্শে একদিন তাহার অন্তর শতদলের সৌরভে পাপড়ি মেলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই শরীরী মানবী তার ভগ্নাবশেষ। বিনোদের সমস্ত অন্তর সহসা যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল, সংক্ষেপে বলিল,—হ্যাঁ এসেছি।

—এসো, ব'সবে চল।

—চল।

শান্তি দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া বিনোদকে বসাইল। বাড়ীতে আর বিশেষ কেহই নাই,—শান্তি বলিল,—এ ক'বৎসর কেমন ক'রে কাটালে? কেমন ছিলে?

—ভালই,—কেটে গেছে এই পর্য্যন্ত—

—ত্যাখো বিনুদা, তুমি যে কি ক'রে বেঁচে ছিলে তা জানতে আমার বাকী নেই, কিন্তু অতীতকে আঁকড়ে ধ'রে থেকে লাভ কি?

বিনোদ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—লাভ ত নেই-ই,—সে আমি জানি, তবে অতীতকেই যে আঁকড়ে ব'সে আছি তাও নয়। পরিবর্ত্তন হ'য়েছে বৈ কি? কিন্তু তুমি কি ক'রে কাটালে—

—বাঙালীর ঘরের বৌ যেমন ক'রে কাটায়, তার মধ্যে গল্প করার মত কি আছে?

বছর সাতেকের একটি মেয়ে এক ঝাঁকা শাক কাঁকালে আসিয়া

দাঁড়াইল। বিনোদের মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া লইয়া শান্তিকে বলিল,—মা, এ কোথায় রাখবো ?

শান্তি বলিল,—মণ্টু, লক্ষ্মীটি যা ঘাটে, অনুকে দিয়ে একেবারে ধুইয়ে নিয়ে আয়।

বিনোদ চাহিয়া রহিল—এ শান্তিরই মেয়ে! বিনোদ লুব্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখখানিকে আর একবার দেখিয়া লইয়া বলিল,—মণ্ট শোনো—

মণ্টু ভীত হইয়া পলাইয়া গেল। বিনোদ হাসিয়া বলিল,—তোমার মেয়ে ?

শান্তি সম্মতি জানাইয়া বলিল,—রাত্রে কিন্তু তোমাকে এখানে খেতে হবে। উঃ কতদিন পরে দেখা, তোমার এ ক'বছরের সমস্ত কথা আমি শুনবো—তোমার কথা শুনে, ভেবে, এ ক'বছর কত অস্বস্তিই পেয়েছি—

বিনোদ হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—রাত্রে খেয়ো কিন্তু—

—আচ্ছা।

উঠানে সদ্যস্নাত একটি ষোড়শী কুমারী আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরবর্ণা, নিটোল স্বাস্থ্য, যৌবনের দীপ্তিতে সমস্ত দেহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সিক্ত কুঞ্চিত কেশপাশ বাহিয়া জলকণা ললাট ও গণ্ডস্থলকে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছে—দেহের স্বর্ণাভা বস্ত্রের কারাগার ভেদ করিয়া বিকীর্ণ হইতেছে। মুখখানি যেন স্বরূপার মুখকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিনোদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শান্তির দিকে চাহিতেই শান্তি বলিল, মাসিমার মেয়ে,—অনু—

আরও একটু আলাপের পর বিনোদ বাহির হইয়া পড়িল। আশে-

পাশের গাছগুলির পানে একবার সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া সে আবার চলিতে লাগিল—

এই ভীরু শান্তি একদিন কেমন প্রণয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখখানি চুরি করিয়া বার বার দেখিত, একটু অভিমানে চোখের কোণে অশ্রু উৎসারিত হইয়া উঠিত…

সেই অতীত আর আজকার এই দিন, এর মাঝে রহিয়াছে একটি সরল রেখার ব্যবধান, যাহার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নাই। এই ন'টা বৎসর, যার দুঃখ দুর্দ্দশা লাঞ্ছনাই একটা জীবনকে জীর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট—আজ তাহার কোন মূল্যই নাই, তাহার কোন অস্তিত্বই নাই।

রাত্রে বিনোদ শান্তিদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গেল।

অনু রাঁধিয়াছে, সে-ই পরিবেশন করিল,—শান্তি বলিল,—অনু ত খুব ভালই রাঁধে, কেমন আজ ভাল হ'য়েছে ত?

বিনোদের জিহ্বার স্বাদগ্রহণ শক্তি বহুকাল আগেই নষ্ট হইয়াছিল, সে বলিল,—বেশ হ'য়েছে—

—অনুর কাজগুলি আমার বেশ পছন্দ হয় কিন্তু,—

বিনোদ হাসিল। সে বুঝিয়াছিল, এই অনুর সঙ্গে বিবাহ ঘটাইবার জন্যই এই উদ্যোগ আয়োজন।

নির্ব্বিঘ্নে ও অনাড়ম্বরে আহার পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া গেল। দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া শান্তি পানের বাটা লইয়া গল্প করিতে বসিল। আকাশের শুভ্র মেঘের মাঝে একফালি শীর্ণ চাঁদ পৃথিবীর পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে,—জোছনার আলোকে গাছগুলি নিশ্চল তন্দ্রাগতের মত দাঁড়াইয়া আছে। বিনোদ সেই দিকে চাহিয়া তাহার ব্যারাক-জীবনের কোনও অকিঞ্চিৎকর আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া শেষ করিল।

শান্তি মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—এত কষ্ট কেন তুমি পাও?

বিনোদ সহসা প্রশ্ন করিল,—তোমার স্বামীকে তুমি সত্যিই ভালবাসো?

শান্তি ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিল,—হ্যাঁ, সত্যিই।

বিনোদ থামিয়া বলিল—আমার আজও ভাবলে বিদ্রোহ ক'রতে ইচ্ছে হয় যে তুমি এমনি পর হ'য়ে গেছ, যার নামও করা আজ নিষিদ্ধ—এ কেমন ক'রে হয়!

—যখন দেখতুম আমার একটা তুচ্ছ কথায় ওঁর অন্তর আনন্দে ভ'রে উঠ্‌তো, সারাদিনের পরিশ্রমের পর যখন ব্যগ্রতার সঙ্গে আমার কাছে ফিরে আস্‌তো তখন তার ওপর অত্যাচার ক'রতে পারি এমন নিষ্ঠুর আমি কিছুতেই হ'তে পারতুম না। সত্যিই বিনুদা, যা আমাকে এমনি ভালবাসে তাকে যে আমি কষ্ট দিতে পারিনে।

বিনোদ হাসিয়া ব্যঙ্গ করিল,—অভাগ্যের কথাটা কি একদিনও মনে হয় নি?

শান্তি স্মিতহাস্তে চোখ দুটি অবনত করিয়া বলিল,—হ'য়েছে, দুঃখও পেয়েছি কিন্তু মেয়েমানুষ, খোঁজটা নিতে গেলেও যে সেটা কত বড় দোষের হয় তা ত বোঝো।

বিনোদের সমস্ত দেহে উষ্ণ রক্তধারা তীব্রবেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। যে এত আপনার, সে আজ কেউ নয়, পর—একেবারেই পর। অথচ এর প্রতিবাদ নাই—সে কি মন! অন্তরের এত বড় চুরি! এ ভালবাসা অর্থহীন, মিথ্যা কথা। বিনোদ এলোমেলো ভাবিয়া চলিল,—এরা কি অন্তর দিয়া অনুভব করে না? জড়ের মত বৃষ্টিতে ভেজে রৌদ্রে পোড়ে!

শান্তি পুনরায় সুরু করিল,—মাসিমার জীবনটা কি দুঃখের, অল্প

বয়সেই এই অনুকে নিয়ে বিধবা হ'য়েছেন, তার পরে ভিক্ষে ক'রে বাড়ীতে দু'টো পাছ পুঁতে, না খেয়ে এই মেয়েকে মানুষ করেছেন। গরীবের ঘরে এত রূপের ঘটা! অথচ এই লক্ষ্মীকে কার হাতে দেবেন, ভেবে পান না। মা তাঁকে এখানে এনেছেন, তাই নেহাৎ দিন গুজরান হ'চ্ছে। আমাদের ত এমন অবস্থা নয় যে একটি ভালছেলের হাতে দি—

বিনোদ হাসিল। শান্তি বোধ হয় তাহাকেই সৎপাত্র অনুমান করিয়াছে।

—ভগবান আছেন, তাঁর যা ইচ্ছে তাই হবে। তার জন্য ভাবিনে বিনুদা, কিন্তু এই কথাটী ভেবে শঙ্কা হয়, যে তাঁর এত আশীর্ব্বাদ মাথায় ক'রে এসেছে এই পৃথিবীতে তাকে সারাজীবন কেবল অপমানই না সইতে হয়!

বিনোদ নিবিষ্ট মনে শুনিয়া যাইতে লাগিল।

—দাদা, তোমরা ত ছবি আঁকো, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব নিয়েই থাকো, তুমি বলো এর কোন খুঁত আছে?

এত বড় প্রশংসা-পত্রের পর আর প্রতিবাদ চলে না, সে বলিল;—হ্যাঁ সুন্দরী সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

শান্তি শান্তভাবে কেবল বিনোদের করুণা আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিনোদ বলিল,—আচ্ছা আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হ'লে তুমি সত্যিই আনন্দিত হবে?

শান্তি ব্যাকুলভাবে বলিল,—তুমি বিশ্বাস কর, আমি মিথ্যে বলিনি।

—তোমার মনে এতটুকুও ব্যথা লাগবে না?

—না, এ যে কত বড় আনন্দের তা শুধু মেয়েমানুষ হ'লেই বুঝতে।

বিনোদ বলিল,—আমি যে কত বড় ভবঘুরে তা ত জানো, না, তা ছাড়া বয়সও তিরিশ হ'লো, আমি কি ওই গৌরীকে উপযুক্ত সম্মান ক'রতে পারবো—উপার্জ্জনের দিক দিয়েও আমি একেবারেই অক্ষম।

—উপার্জ্জন যা ক'রবে সেই ঢের।

বিনোদ হাসিয়া বলিল,—তা তোমার স্বামী ত শুনেছি ভাল চাকুরী করেন, তার বয়সও আমাদেরই সমান—তাকেই ব'লে ক'য়ে অনুকে ঘাড়ে ক'রতে বল না!

শান্তি গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল,—তুমি ত খুব বিনুদা! মানুষে ব'লতেই বলে, বোন সতীনের ঘর।

বিনোদ হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু সমস্ত অন্তর জুড়িয়া কেবল কান্নাই হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। যাহার একটু স্মৃতি আজ দীর্ঘ নয় বৎসর পরেও, তাহার সমস্ত অন্তরটা আলোড়িত করিয়া দেয়, তাহারই অন্তরে আজ তাহার নামটাও নাই, সমস্ত কর্পূরের মত নীরবে উবিয়া গিয়াছে। অনুকে সে স্বামীর স্কন্ধে চাপাইতে পারে না, অথচ তাহার কাঁধে চাপাইতে তাহার ব্যগ্রতার অন্ত নাই। বিনোদের বুকের হাড়কয়খানি ভাঙিয়াই যেন একটি অতি দীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল,—আজ নিশ্বাস লইতেও যেন অনেক দম লাগে—পঞ্জর যেন ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে!

দেখে—আকাশভরা তারা, কোনটা ধ্রুবতারা, কোনটা কাল পুরুষ, কোনটা সপ্তর্ষিমণ্ডল,—এরাও হয়ত এমনি এক একটা পৃথিবী, তাহার মাঝেও এমন কত সুখ দুঃখের কাহিনী,—এমন কত পথ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে······ওরাও একটি নারীর মত, নিজের আলো নাই, সূর্য্যের আলোকে ঝিকমিক্ করে—

কি যেন একটা বন-ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিল। এমনি করিয়া সে একদিন শান্তির যৌবন-গন্ধে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল! বিনোদ ভাবে এমন সুবাসে কোন প্রয়োজন আছে কি? যাহারা কাছে থাকে তাহাদেরই মনোরঞ্জন করে—হয়ত ওর জীবনের ওটুকুই একমাত্র কাজ।

গত রাত্রির সমস্তখানিই যেন একটা দুঃস্বপ্নের ধারাবাহিক দুর্ঘটনার মত—সকালে অকারণেই মনটাকে ব্যথিত করিয়া তুলে।

বিনোদ তুলি লইয়া অসংবদ্ধভাবে রঙের প্রলেপ দিয়া যাইতেছিল। মা পাশে বসিয়া চোখের জলে তাহার জীবনের দুঃখ-কষ্টের ইতিহাস বিবৃত করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন,—বিনু, তোর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি। তুই আর দুঃখ দিস্‌নে লক্ষ্মী, অনু মেয়েটি বেশ। আমি দেখে মরি, মানুষের ছেলে হয়, বাপ মাকে সুখী ক'রবে ব'লে আশা ক'রে—

বিনোদের অন্তরটা তিক্ত বিষাদে ভরিয়া ছিল, বলিল,—ওর বাপ-মার অন্যায় আশা মা, ছেলে মানে ক্রীতদাস নয়, আর সকলের ছেলেই ত ভাল হয় না, সেজন্য দুঃখ করা বৃথা। এত তাড়াতাড়ি কি? ভেবে দেখি,—অনুর বিয়ে ত দু-একদিনের মধ্যেই হ'য়ে যাচ্ছে না।

মাতা অনেক বক্তব্য অনেকক্ষণ ধরিয়া বর্ণনা করিলেন। বিনোদ বলিল,—আমি চ'লে গিয়েছিলাম কেন তাই বলি, আমি কারও উপর রেগে যাইনি। বিশ্বাস কর আর না কর ব্যাপার সত্যিই তাই। যারা অসাধারণ তাদের এই সাধারণের দলে ফেলে তাদের মত ক'রে তার কার্য্যপদ্ধতি বিচার ক'রলে, অবিচারই করা হয়। তাই সহ্য ক'রতে না পেরে গিয়েছিলাম—জানো?

মাতা বিশেষ কিছু বুঝিলেন না—তবে আবহাওয়ায় কথঞ্চিৎ আশান্বিতা হইয়া উঠিয়া গেলেন।

বিনোদ দুপুরে শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—অতি নম্র পদক্ষেপে অনু মণ্টুকে সাথে লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। বিনোদ সবিস্ময়ে বলিল,—অনু, তুমি এখানে! শান্তির বোন তাই তুমি ব'ললুম মনে কিছু ক'রো না।

অনু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—শান্তি দিদি আপনার কাছে একখানা বই চেয়ে পাঠালেন, তাই।

—আমার কাছে ত কোন বই নেই অনু—শান্তিকে ব'লো। কিন্তু একটা কথা শোনো, এদিকে এসো—

অনু স্বস্থানে দাঁড়াইয়াই বলিল,—বলুন—

—তোমাকে নির্জ্জন দুপুরে এমন ক'রে বই নিতে পাঠানোর অর্থ তুমি জানো?

অনু নীরবে মাথা নত করিল।

—যদি না জানো তবে শুনে রাখো। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চ'লছে তা বোধ হয় জানো। দোকানে দ্রব্য-সম্ভার সাজিয়ে রাখে খরিদ্দারকে প্রলুব্ধ ক'রতে তাও দেখেছ বোধ হয়—তোমাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য অবিকল ওই প্রকারের কিন্তু যে বয়সে, মনের যে অবস্থায়, মানুষ মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ে সে অবস্থা আমার আর নেই, তাই ব'লছি নিজেকে এমন ক'রে আর অপমান ক'রো না—এর চেয়ে বড় অপমান তোমাদের আর নেই।

অনু লজ্জারুণ ম্লান মুখখানি লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। বিনোদ বলিল, —আর একটা কথা শোনো, আমি যে এত বড় একটা অসম্মানকর কথা তোমাকে ব'লেছি, তা শান্তির কাছে ব'লো না, কারণ সে ব্যথা পায় এমন কাজ ক'রতে আমিও ব্যথা পাই। বিয়ে যদি করি তা হ'লে, যে-কোন মেয়েকেই সাদরে বরণ ক'রবো, কারণ জগতে আজ সব মেয়ের দামই আমার চোখে সমান।

অনু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ দেখিল,—অনু সত্যিই সুন্দরী, নিবিড় নিতম্বের উপর ঘনকৃষ্ণ আলুলায়িত কুন্তল, সমস্ত দেহে যৌবনের জীবন্ত জোয়ার, মুখে প্রশান্ত অনবদ্য শ্রী—দুঃখ দুর্দ্দশায় ম্লান, দেখিলে করুণাই হয়।

বৈকালে শান্তি আসিয়া বলিল,—দাদা, চল, নৌকায় বেড়াতে যাই—জোছনা রাত্ত ফিরতে দেরী হ'লে ক্ষতি নেই। মা যাচ্ছেন, ও-বাড়ীর খুড়ীমা……

বিনোদ বলিল,—তোমাকে নিয়ে এমন অনেক বেড়াতে গেছি, না? কিন্তু আজ এ বেড়ানোর মাঝে কেবল বোধ হয় দুঃখই জমে' উঠ্‌বে—

—ও সব কি কথা, ছিঃ! চল—

বিনোদ নির্ব্বাকভাবে বলিল,—চল!

নৌকা-বিহারে যাইবার সময় শান্তির বহু আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া অনু শুধু একটা সুস্পষ্ট 'না' বলিল। শান্তির মা'র অনুরোধে সে নীরব প্রতিবাদ জানাইল কিন্তু বয়সের মেয়ের একা থাকা সম্ভব নয় তাই যাইতেই হইল।

দিক্‌চক্রবালের উপরে ক্লান্ত রবি আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি অনেক গল্প বলিল, বিনোদ কেবল শুনিল, কোন উত্তর করিল না। শান্তির মেয়েটি বারবার জলে হাত দিতেছিল, বিনোদ মিষ্টস্বরে বলিল,—লক্ষ্মীটি অমন ক'রতে নেই।

কিন্তু অনুর চোখ দুটি লাল হইয়া আছে, দুপুরের সেই শান্ত শ্রী নাই। অন্তরে কিসের যেন একটা ঝড় চলিয়াছে, তাহারই প্রতিবিম্ব সমস্ত মুখখানাকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। বিনোদের মনটা অনুশোচনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল—যাহারা জীবনে কোন দুঃখ পায় নাই, তাহাদের এমন করিয়া দুঃখ দেওয়া, বেদনা দেওয়া, হয়ত বা ঠিক হয় নাই কিন্তু

যাহাদের জ্ঞান অপরিপক্ক হইয়া রহিয়াছে তাহাদের একটু সাহায্য করিলে ক্ষতি কি!

বিনোদ ভাবিয়া পায় না—

আরও কয়েকটা দিন চলিয়া গেল—

শান্তি আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র কন্যাটিকে সঙ্গে করিয়া দুপুরে গল্প করিতে আসে। তাহার বক্তব্য নিত্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়া দেখা দেয়, কিন্তু ভাবার্থ একই—অর্থাৎ অনু সর্ব্বসুলক্ষণা, এমন কি তাহার একটু পূর্ব্বরাগও সঞ্চিত হইয়াছে, অবিবাহিতা ভবঘুরে জীবন দুঃখে আকণ্ঠ নিমজ্জিত; গৃহস্থালীর একটি নীড় রচনা করিয়া উপবাসে থাকাও সুখের, মানুষে দেহের সুখ চায় কতটুকু! অন্তরের দুঃখই ত দুঃখ ইত্যাদি,—এক কথায় এই বিবাহই জীবনে সুখী হইবার একমাত্র এবং অতি অবশ্যকীয় পথ।

শান্তি ডাকিল,—মণ্টু এদিকে আয়, কি ক'রছিস্?

মণ্টু বলিল,—এই ত খেল্‌ছি।

—না, এদিকে আয়।

বিনোদ বলিল,—থাক্ না।

—না—না—

বিনোদ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। শান্তি বলিল,—হাস্‌লে যে বিনুদা?

—আমার সঙ্গে একা দেখা ক'রতে তোমার ভয় হয়, তাই দেখে।

এমন একটা নিছক সত্য কথার উত্তরে শান্তি কিছুই বলিয়া উঠিতে পারিল না। অল্পক্ষণ পরে বলিল,—যা ভেবে নাও তাই।

সেদিন শান্তির আন্তরিকতার বৈঠক আর তেমন জমিল না। কষ্ট,

শান্তিকে সঙ্গে করিয়া বিদায় লইল। বিনোদ বুঝিল, শান্তির অন্তরে তাহার জন্ত করুণা অনেকখানিই সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তবে সে নিজে কিছুই দিতে পারিবে না। মানব মনের এই এক অপূর্ব্ব হেঁয়ালী। এই অতি দীর্ঘ নয়টি বৎসর এমন করিয়া কাটাইয়া দেওয়া, যাহার দুঃখ দৈন্যের স্মৃতিই আজ বুকখানাকে দীর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট !

বিনোদের বৌদি আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতেছিলেন, বলিলেন,—ও সব ছবি-টবির কম্ম নয়, ওতে কি প্রাণ আছে, একটা বাস্তব মেয়ে না হ'লে কি আর হয় !

বিনোদ বলিল,—তাই ভাবছি, বিয়ে ক'রলে তুলি কম্পাস জলেই ফেলে দিতে হবে ! বৌদি, মেয়েরা ততক্ষণই সুন্দর যতক্ষণ সে দূরে থাকে—

—ভুল ঠাকুরপো,—তখনকার ছবিই হবে জীবন্ত, প্রাণপূর্ণ—

বিনোদ নির্ব্বিকার ভাবে বলিল,—কি জানি !

বৌদির রসিকতাও এই নির্ব্বিকার প্রাণের সংস্পর্শে নিরস হইয়া উঠিল, তিনি অগত্যা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিনোদের ঘরটার পাশেই একটা জানালা, তাহারই পাশ দিয়া মেয়েদের ঘাটে যাইবার পথ। বিনোদের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই পল্লী-বধূরা স্নান সমাপ্ত করিয়া ভিজা কাপড়ে ফিরিয়া যায়। শান্তিও এই পথ দিয়াই স্নানে যায়, কোনদিন কলসী কাঁখে দাঁড়াইয়া দু'টি কথা বলে, কোনদিন সময় পায় না, অনু প্রায়ই তাহার সঙ্গে আসে না।

কয়েকদিন পরে কি যেন একটা ব্যাপারে বিনোদ সকালেই জাগিয়াছিল। অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের ফলে বুভুক্ষুর মত বিড়ি টানিতেছিল—

শান্তি ডাকিল,—বিনুদা—

-এই যে শান্তি, আজ একটু সকালেই ঘুম ভেঙেছে।

—সকালে ত নটায়! তোমার কি শরীর ছিল আর কি হ'য়েছে! রাত জাগবে আর সারাটা দিন ঘুমোবে, ওইতেই ত শরীরটা গেছে—

—যে কয়দিন বেঁচে থাকি সুখে থাকতেই চাই। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চাইনে, তাই তোমাদের সঙ্গে মতামত আমার মেলে না।

শান্তির পিছনে দাঁড়াইয়া অনু। লজ্জানম্র আনমিত চোখদু'টি বিনোদেরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে—চোখের কোণে কালির প্রলেপ, কেশের স্তবকে স্তবকে রুক্ষতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যৌবনের উদ্দাম প্রফুল্লতা নাই, দুঃখ দারিদ্র্যের ম্লানিমা আছে। সমস্ত চোখদু'টি ছাইয়া শিশুর সরলতা—

শান্তি বলিল,—তোমার সবই ত অদ্ভুত; কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত—

—অনুর কি অসুখ?

শান্তি হাসিয়া বলিল—ঠিক অসুখ নয়, তবে সুখও নেই—

শান্তির বিদ্রূপে অনুর মুখে কোন ভাব বিপর্য্যয় দেখা দিল না, বিনোদ একটু হাসিয়া বলিল,—ও তাই বল!

মণ্টু শান্তির কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। শান্তি—বেলা বেশী হইয়াছে অজুহাতে চলিয়া গেল। বিনোদ পুনরায় বিড়ি ধরাইয়া বসিল।

কার্ত্তিকের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহ চলিয়া গেল। শান্তি বিনোদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্তই হইয়া পড়িল। ওই বিদ্রোহী মনটাকে আয়ত্ত করিবার যতগুলি অস্ত্রের আয়োজন সে করিয়াছিল একে একে তাহার সবগুলিই ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন নূতন প্রকার মারণাস্ত্র প্রয়োজন। শান্তি সেদিন মুখোমুখি একটা হেস্তনেস্ত করিবে বলিয়া আসিয়া বসিল।

আজ দুপুর শিকারী বাজের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

শান্তি অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—তুমি এই বিয়ে ক'রবে কিনা, তার স্পষ্ট উত্তর চাই—

—এত শিগ্‌গির ?

—হ্যাঁ, অঘ্রাণের ত আর দেরী নেই—

—আমি ত ব'লেছি, বিয়ে করা বিষয়ে আমার কোনই আপত্তি ছিল না, কিন্তু এই বিয়ে করাটাই আমার কাছে এত ছেলেমানুষী ব'লে মনে হয় যে, ও আর আমি ক'রতে পারবো না।

—ও সব কথা নয়,—আমি স্পষ্ট উত্তর চাই—

বিনোদ বলিল,—স্পষ্ট উত্তর দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তা শুনে তুমি আদৌ সুখী হবে না। সত্যিই ব'লছি, তোমাদের উপর আর কোন শ্রদ্ধাই আমার নেই। অনু আমাকে ভালবাসবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, আমি তা বিশ্বাস করি কিন্তু আমার কাছে তার আর প্রয়োজন নেই। আমার বিশ্বাস, যদি সরকার থেকে তোমাদের খাদ্য ও অন্যান্য অভাব পূরণ করা হ'তো তবে তোমরা কাউকে আপনার ক'রে নিতে না, জড়ের মত ব'সে থাক্‌তে; না হয় পুরুষের আকর্ষণে বিকর্ষণে একটু একটু মাথা নাড়াতে—এ আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি। কাজেই বিবাহের এই মহৎ অনুষ্ঠানকে আমার কাছে আর স্বর্গের সিঁড়ি ব'লে মনে হয় না।

শান্তি বলিল,—ও সব তর্ক ত' এই পনর দিন ধরে ক'রলুম, কিছুই হ'ল না। তুমি হাঁ নয় না, একটা কথা বল—

বিনোদ নিঃসঙ্কোচে বলিল,—না। তোমার কথায় নিঃসঙ্কোচে না ব'লতে পারতুম না, আজ তোমাকে স্বচ্ছ পদার্থের মত দেখতে পাচ্ছি তাই—পারলুম—

শান্তি এতটা আশা করে নাই। দুঃখে ক্ষোভে শান্তি বাকহারা হইয়া

গেল। সহসা বলিল,—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই ক'রতে হবে—তোমাকে ভালবেসে আমি ঠকেছি এ কোনদিন ভাবিনি—তবে তুমি ন'টা বছর যে দুঃখে অত্যাচারে বেঁচে ছিলে তা শুনতে আমার বাকী নেই, তাই আমি—

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল,—তাহার চোখ দুটি জলে টলটল করিতেছিল। বিনোদ বলিল,—তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আজ বিচার ক'রছো সেখান থেকে আমাকে ভালবেসে ত তুমি সত্যই ঠকোনি।

শান্তি বলিল—বুঝেচি, আজ থেকে উপবাস সুরু ক'রবো ব'লে যাচ্ছি—যতদিন না তুমি এ বিয়ের মত দেবে। সেজন্য আমি মরণ পর্য্যন্তও অপেক্ষা ক'রবো—

শান্তি দ্রুত পায়ে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমার কপালে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিতে যদি তোমার দুঃখ না হয় তবে সে কলঙ্ক আমি মাথা পেতে নেব।

অপরাহ্ণ। পড়শীর নারিকেল গাছে শঙ্খচিলের বাসা। চিল বসিয়া বসিয়া চিঁ চিঁ করে। ঘরের কোণে একটা বাক্স, বিড়ালের ছানা হইয়াছিল, বিড়ালী নিত্যই দুধ খাওয়াইত,—বিনোদ দেখিয়া ভাবিয়াছে, দুধ না খাওয়াইলে স্তনের মাঝে বেদনা হয়, দুগ্ধ নিষ্কাষণ আরামপ্রদ—তাই। তাহারই একটি ছানা একটা পুরুষ বিড়াল মারিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে—ওই মাংসটাই ওর কাছে স্বাদু আহার্য্য। ওই বিড়ালই বিড়ালীর স্বামীর মত—ওতে বিড়ালীর কোন আপত্তি নাই। চিলটা বসিয়া চিঁ চিঁই করে, আর একটা চিল আসে সন্ধ্যায়। দুইজনে নীড় রচনা করিতেছে। ওদেরও দাম্পত্য কলহ হয়, বিনোদ দেখিয়া দেখিয়া হাসে—ওটা সহজ প্রবৃত্তি। মানুষও মনোবৃত্তির দিক দিয়া বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারে নাই।

উপবাসের প্রথম দিন বৈকালে শান্তির মা আসিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে বসিলেন বিনোদেরই কাছে—বাবা বিনু, শান্তি যে আমার কি একগুঁয়ে মেয়ে, আজকার সারাটা দিন কিছু খায় নি। কি যে অপরাধ ক'রেছি কিছুই বুঝিনে—নাকি, ওদের কোন কিছু হ'ল! তোর কথা সে একটু শোনে, আমাদের কথা তো গ্রাহ্যই করে না, বলে—শরীর ভাল না। তুই বাবা যদি একটু ব'লে ক'য়ে—

বিনোদ তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—শরীর হয়ত সত্যিই ভাল নেই। আর আমি ব'ললেই কি খাবে? রাত্রে খাবে'খন, চিন্তার কিছু নেই।

শান্তির মা অন্যান্য অনেক কথাই বলিলেন এবং ক্রমাগত এই অকারণ উপবাসহেতু তিনি মহাসঙ্কটে পড়িয়াছেন তাহাই সালঙ্কারে পাড়ায় পাড়ায় বিবৃত করিতে লাগিলেন—শান্তি ত এমন অশান্ত ছিল না। কি হইয়াছে!

পাড়ার প্রাজ্ঞ খুড়ামহাশয় বলিলেন,—কারণ না থাক্‌লে কার্য্য হয় না বৌ-ঠাক্‌রুণ। ওর জন্য ভাবনা কি! একটু হাওয়া, সব উপবাস কেটে যাবে, ব্যস্।

কথাটা রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে ইহার মূলগত কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। রাঙাঠাকুমা বলিলেন,—আহা, বিনোদ ছোঁড়ার বিয়ের প্রায় মত হ'য়েছিল, বুঝিবা আবার—

বড়বাড়ীর বড়বৌ বলিলেন,—আফিং টাফিং খাওয়াখাবি না হয়,—অত যাওয়া-আসা দেখেই মন টুক্ টক্ ক'রেছে—

বিষদ ব্যাখ্যার স্থূল বক্তব্য বিনোদের শ্রুতিগোচর হইল। বিনোদ ভাবিল,—এই ক্লেদপূর্ণ অন্তরগুলির সঙ্গে বাস করা দুরারোহ গিরিবর্ত্ম!

উপবাসের দ্বিতীয়দিন বৈকালে মণ্টু আসিয়া বিনোদকে বলিল—মামা, মা আপনাকে ডাক্‌ছে। সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে বলেছে।

—চল। এ ডাক যে পড়িবে বিনোদ তাহা জানিত,—দুইদিনের উপবাসেই হয়ত ক্লান্তি আসিয়াছে!

বিনোদ উপবাস-ক্লিষ্ট শান্তির শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল। শান্তি অনুদাত্ত স্বরে কহিল,—দাদা তোমাকে ডেকেছি একটা কথা ব'লতে,—এই দু'দিনে পাড়ায় যে কি কথা জল্পনা কল্পনা হ'চ্ছে তা বোধ হয় শুনেছ।

—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে তোমার লজ্জার কিছু নেই। কেন? আজ আমাকে ভালবাসাটাই কি খুব লজ্জাকর?

শান্তি পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। বিনোদ আবার বলিল,—তুমি এ উপবাস ক'রতে পারতে না, কিন্তু তোমাদের আত্মবোধ ক'রবার মত শক্তি নেই, তাই অন্যের ওপর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই মেয়েরা প্রতিযোগিতায় সব চেয়ে অগ্রণী—আমার অন্তরের সঙ্গে এটা প্রতিযোগিতা কিনা তাই পেরেছো।

শান্তি কিছুই বলিল না। সে কৃশাঙ্গী, দুইদিনের উপবাসে সে একেবারে শীর্ণা হইয়া পড়িয়াছে, কথা বলিবার সামর্থ্যও যেন নাই! বিনোদ চাহিয়া দেখিল, শান্তির আঁখিপ্রান্ত বহিয়া একফোঁটা অশ্রু নামিয়া আসিতেছে।

বিনোদ বলিল,—যে গেছে তাকে কি ক'রে ফেরাবে? উঠে খাও।

শান্তি ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল, বলিল—এত কলঙ্ক যদি মাথা পেতে নিতে পেরেছি, তখন না খেয়েও থাকতে পারবো। দেখি, তোমার প্রাণটাই বা কত নির্ম্মম।

বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। শান্তি আবার বলিল,—এখন যদি তুমি আমাকে সত্যিই পাও, তবে কি তুমি যে-শান্তিকে খুঁজচ সেই শান্তিকে ফিরে পাবে ভাবো?—সে-শান্তি যে বহুকাল মারা গেছে বিনুদা!

বিনোদ ম্লান হাসিয়া বলিল—তা জানি শান্তি। কিন্তু তোমাদের

চাওয়ার সঙ্গে পুরুষের চাওয়ার তফাৎই ওইখানে—পুরুষ চায় স্বপ্নকে, তোমরা চাও বাস্তবকে। তাই পুরুষ কোনদিন তৃপ্তি পায়নি এ জগতে—

বিনোদ কি যেন ভাবিয়া চলিল—হঠাৎ অনু ঘরের মাঝে ঢুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। শান্তি বলিল—দাদাকে একটা পান দে অনু—

অনু পান দিয়া গেল।

বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল—আমার এ বিয়েতে তুমি সত্যিই সুখী হবে!

—কতবার আর ব'লবো দাদা?

—তোমার অন্তরকেই আমি চিনতে চাই, তুমি আমার সঙ্গে আগাগোড়া থাকতে পারবে ত?

শান্তি সমস্ত ক্লান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—নিশ্চয় দাদা।

—তবে অনুকে একবারটি ডাকো—

শান্তি বিনোদের পায়ের উপর মাথাটা রাখিয়া প্রণাম করিল। আলুলায়িত তৈলহীন চুলের গুচ্ছ পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। বিনোদ হর্ষে, গর্ব্বে, বিস্ময়ে, স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল, প্রতিবাদ করিল না।

অনুকে সঙ্গে করিয়া শান্তি ফিরিলে বিনোদ বলিল—ছবি আঁকতে পারি হয়ত, কিন্তু সেটা বিয়ে ক'রবার পক্ষে বাংলা দেশে একেবারে প্রতিকূল অবস্থা। বয়সও তিরিশ হ'ল। মানুষ যে কি অদ্ভুত তার ত পরিচয় পেয়েছ, চিন্তা ক'রে মতামত দিও। হিন্দুর বিয়ে মানে জীবনের যবনিকা পতন।

বিনোদ জানিত না, মেয়েরা অসাধারণই চায়, সে সন্দিগ্ধচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

রাত্রেই কথাটা বিনোদের মার কানে পৌঁছিল। তিনি মানসিক সত্যনারায়ণের পূজার ফর্দ্দটা রাত্রেই ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে গ্রামে চাঞ্চল্য দেখা দিল। পড়শীর বিবাহে এক পশলা নূতনত্ব উপভোগ করা যাইবে। গ্রাম্য বিজ্ঞের দল প্রত্যহ কার্য্য তদারক করেন, খরচের ফিরিস্তি আঁটেন, বাড়ী ফিরিবার সময় একটি পান বামহস্তে ও দক্ষিণহস্তে এক ছিলিম তামুক লইয়া ফিরেন। বলেন,—বৌভাতে পোলাও না হ'লে মানায়? বিনুর বিয়ে, ছোট ছেলের বিয়ে, আর ত দেবেন না, কি বলেন বৌঠাকরুণ? অন্য সকলে আর্দ্র রসনা হইতে লালা গলাধঃকরণ করিয়া বলেন—বটেই ত বটেই ত।

বিনোদের শুভবিবাহ এবং অনুকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন নির্ব্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। কেবল—বাসরঘরে অনুর পাশে বসিয়া শান্তি খেলার উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিনোদ তখন বসিয়া ভাবিতেছিল—জীবনের এই শ্রেষ্ঠ নয়টি বৎসর এমন করিয়া কাটানো, যে বৎসর কয়টার অত্যাচারে দেহে বার্দ্ধক্যের জীর্ণতা আসিয়াছে, এমন করিয়া কাঙালের মত ঘুরিয়া বেড়ানো,—এ সম্পূর্ণ অর্থহীন, তাহার স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; কোন ব্যাখ্যা নাই, কোন পুরস্কার নাই। সে জানে শুধু দু'টি বন্ধু বগলা আর বিপিন—অভাগ্যের দল আজও তেমনি কুকুরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়! তারও মূলে এমনি একটি নারী, শান্তির মতই—তারও আজ কোন পুরস্কার নাই।

বাসর ঘরের মাঝেই রুমালের অন্তরালে বিনোদের দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল। শান্তি তাহা দেখিয়া নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—বিনোদ জবাব দিয়াছিল—আমার দুইটি অভাগা বন্ধু ছিল, তাদের জন্যই, তারা বড় দুঃখী কিন্তু তারা জানলো না—

শান্তি বলিল,—তাদের নিমন্ত্রণ ক'রলে না কেন?

—জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, মানুষের মত শিল্পীর মত বেঁচে থাক্‌বো, তাই তুলি হাতে নিয়েছিলাম কিন্তু যেখানে আজ দাঁড় করিয়েছ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে এ স্বীকার ক'রতে লজ্জা পাই। আর তাদের এই বন্ধুটি আজ এমন ক'রে বিদায় নিচ্ছে একথা মুখোমুখি বলতে পারি এত শক্তি আমার নেই, তাই পত্রে জানাবো ভাবছি। আর জানো শান্তি, এই বিয়ের আগাগোড়া এত ছেলেমানুষী মনে হ'য়েছে, ওই টোপোর মাথায় দেওয়া, পাল্কীতে চড়া, ছিঃ ছিঃ—

শান্তি কিছু না বুঝিয়াই বলিল,—যারা বুড়োকালে তৃতীয় পক্ষ করে তারা ?

ফুলশয্যার মহার্ঘ রাত্রি—

বিছানায় সত্যই ফুলের অভাব নাই। সমস্ত প্রস্ফুটিত, মুকুলিত পুষ্প ও কোরক ছিঁড়িয়া আনা হইয়াছে বিনোদের পুষ্পোৎসব সুসম্পন্ন করিতে।

বিনোদ শুইতে গেল—

নির্জ্জন ঘরের মাঝে একটি মাত্র আলো জ্বলিতেছে, অনু ফুলশয্যার এক পার্শ্বে গুণ্ঠনাবৃত হইয়া শুইয়া আছে। শুভ্র হাতখানা রজনীগন্ধার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। সকলেরই ভয় ছিল বিনোদ হয়তো অনুকে ডাকিয়া তেমন ভাবে আলাপ করিবে না। বৌদি তাই বলিলেন,—ঠাকুরপো আজ রাত্রে আলাপ ক'রে নিতে হয় নইলে অকল্যাণ হয় জানো তো ?

বিনোদ বলিল,—জানা ছিল না, এখন জানলুম।

দরজা বন্ধ করিবার অনুমতি দিয়া বৌদি প্রস্থান করিলেন।

বিনোদ জানালাটা খুলিয়া দিয়া টেবিলের নিকট বসিয়া বলিল,—অনু, তুমি ঘুমাও একখানা চিঠি লিখে নি।

বিনোদ চিঠি লিখিতে লাগিল, অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া অনু দেখিল, পরে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি ধীরে ধীরে প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে নিথর নিস্তব্ধতা রুদ্ধ নিশ্বাসে কান পাতিয়া আছে,—নিঝুম রাত্রের একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর একটু প্রাণবন্ত শব্দ।

অনু অকস্মাৎ জাগিয়া দেখে—টেবিলের লণ্ঠনটী ঠিক তেমনি জ্বলিতেছে। সামনে বসিয়া বিনোদ কঠিন, কঠোর, পাংশু মুখে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে; সমস্ত চোখের জল যেন অগ্নিশিখার মত লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে, বুকের রুদ্ধ ক্রন্দন চাপা দাঁতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না, অবাস্তব কল্পনার মাঝে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে—

অনু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, তথাপি বিনোদের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই। বিনোদ তেমনিভাবেই অন্ধকারের বিভীষিকার পানে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া।

অনু অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল,—কি ভাবছেন?

বিনোদ ফিরিয়া চাহিল। অনু বুঝিতে পারিল বিনোদ তাহার প্রশ্ন বুঝিতে পারে নাই, সে আবার বলিল,—কি ভাবছেন?

—ভাবছি একটা কথা। ফুলশয্যার রাত্রে তোমার সঙ্গে কোন কথাই বলিনি ব'লে দুঃখিত হ'য়েছ?

অনু মাথা নীচু করিল।

বিনোদ অনুর শুভ্র আঙুল লইয়া কি যেন দেখিল, তাহার পর বলিল,—অসন্তুষ্ট হ'য়ো না। বন্ধুবান্ধবের মুখে তাদের ফুলশয্যার কাহিনী

শুনেছি কিন্তু তেমনি ক'রে আলাপ করাটা আমার কাছে এত ছেলেমানুষী মনে হ'য়েছে যে কিছুতেই তা পারিনি। তুমি এ বিয়েতে মত দিয়ে ভাল করোনি অনু, তুমি সুখী হবে না। আমার জীবনের কিছুই ত জানো না অনু।

অনু অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দুটি তুলিয়া বলিল—কি ভাবছিলেন!

—তা শুনলে সুখী হবে না, তবুও শুনতে চাও—

অনু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বিনোদ একটী দীর্ঘশ্বাস নিক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিল—এই ফুলশয্যার রাত্রেই আমার জীবন-নাট্যের যবনিকা পড়ে গেল, তাই ভাবছি। তুমি ঘুমোও আমি চিঠিটা শেষ ক'রে নি।

বিনোদের তথাকথিত তিরোধানের পরে বগলা ও বিপিনের দিন একরকম ভাবেই চলিয়া যাইতেছিল, বিপর্য্যয়ের মধ্যে, অতিরিক্ত ঘর্ষণের ফলে ভাঙা বেহালার আর একটি তাঁত ইন্দ্রলীলার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সকাল ন'টায় পিওন গায়ের উপর ভারী দুইখানি চিঠি ফেলিয়া দেওয়ার ফলে, দুইজনে ঘুম হইতে উঠিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল। একখানা চিঠি বিনোদের—হস্তাক্ষরেই চেনা গেল, অন্যখানি কোনও আফিসের। বিনোদ লিখিয়াছে—

বগলা ও বিপিন,

তোমাদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে কোন চিঠিই দিইনি, [illegible] যাওয়ার ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল, কিন্তু আজ আবার নূতন খবর;—বিয়ে ক'রেছি,

বৌএর নাম অনু, পূর্ণনামটি অনুপমা, অনুসূয়া কি অনিমা আমি এখনও জানতে পারিনি।······

এখানে এসে অবধি একটা কথা ক্রমাগতই মনে হ'চ্ছে—মেয়েরা বড় দুর্ব্বল, তাদের পদে পদে শঙ্কা, কোন্ পথে পা বাড়াবে বুঝে পায় না। তার ওপর আবার নীতিশাস্ত্রের অশেষ বিধি-বন্ধনে পা দু'টো অচল হ'য়ে প'ড়েছে। দুর্ব্বল ব'লে তাদের জীবনে কোন principle নেই; থাকতেও পারে-না। তারা বনের ফুলের মত, যারা কাছে থাকে সুবাস পায়, যারা দূরে থাকে তারা পায় না—তারার মত ঝিকমিক্ করে, নিজের আলো নেই, পুরুষের আলোয় জ্বলে, তা নইলে তারা জড়ের মত জীবনী-শক্তিহীন। শান্তি এখানে আছে, অথচ এর মনে আমার জন্য এতটুকু বেদনা নেই, মাত্র নিজের সুনামের পক্ষে একটু ভয় ও দ্বিধা আছে। স্বামীকে সে ভালবাসে,—আজ আমাকে সে আনন্দে অনুর হাতে সমর্পণ ক'রেছে কিন্তু স্বামীর ভাগ দেওয়ার নাম শুনে আঁৎকে উঠেছিল। এরা এত সংস্কারান্ধ যে ভালবাসা কথাটার ব্যাখ্যা এরা খুব উঁচু ক'রে দিলেও অন্তরে বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করে না। এদের ভালবাসা যেমন নিবিড় তেমনি ভঙ্গুর। যে নয়টী বৎসর আমার দুঃখ দৈর্ঘ্যে দীর্ঘ, তার সাক্ষী তোরা, আজ জগতে সে দুঃখ একেবারেই অর্থহীন।

অনু আমার স্ত্রী—তারও দেখেছি, যেদিন থেকে সে বুঝেছে আমার কাঁধের উপর ভর না দিলে তার জীবন অচল, সেদিন থেকে আমার ওপর তার দরদের সীমা নেই। আমার দিক থেকে আগ্রহহীনতায় সে বেদনা পেত, বেশ বুঝতুম; কিন্তু ওই অনুর যদি অন্যের সঙ্গে বিয়ে হ'ত তবে যে অনুরূপই হ'ত একথা শপথ ক'রে ব'লতে পারি।···

ওদের ওপর অভিমান ক'রে দুঃখ করা মূর্খতা। ইতি—

বিনোদ

বগলা চিঠিখানা হাতে করিয়া বিস্ময়ে হাঁ করিয়া রহিল। বিপিন ভাঙা বেহালায় আমেজ লাগাইবে বলিয়া ছড় তুলিয়া লইতেছিল, বগলা বলিল,—বেহালা রাখ্ ব'লছি—নইলে ভেঙে দেব!

বিপিন সভয়ে ছড় রাখিয়া দিল। বগলা বলিল,—বিনোদ বিয়ে ক'রলে! এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কিছু হয়! এ বিয়ের কোন মানে হয়! বিনোদ নেহাত দুর্ব্বল, শাস্তি দু'দিন উপবাস ক'রলে আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের যবনিকা পতন!

বিপিন বলিল,—যাক্‌গে, আর ত উপোস ক'রতে হবে না! ও ঠিকই ক'রেছে।

—ছাই ক'রেছে। আচ্ছা তুই বিয়ে ক'রবি?

—নিশ্চয়ই, তবে ধর মানুষ না হ'য়ে নয়। ৪৫৲ টাকার চাকুরী যদি একটা পাই, ২০৲ টাকায় মাস চলে ২৫৲ টাকা সঞ্চয়। বছরে ৩০০৲ টাকা, দশ বছরে তিন হাজার টাকা; তখন দেশে গিয়ে এগ্রিকালচার। বেশ মানুষের মত সংসার পাতা চ'লবে। বয়েস! তা দ্বিতীয় পক্ষেও ত কতজন বিয়ে করে।

বগলা ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া দ্বিতীয় পত্রখানা খুলিয়া দেখিল,—একটা গালার আফিসের স্বত্বাধিকারী, বিপিনের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়াছেন। যাইতে হইবে দূরে,—মধ্যভারতের বনে আর গাছ হইতে লাক সংগ্রহ করিতে হইবে, চাষ করিতে হইবে। যাওয়া ও পোষাকের জন্ত অগ্রিম পঁচিশ টাকা। মাহিয়ানা ৪৫৲ টাকা। আগামী শনিবারেই যাইতে হইবে। অদ্য অফিস হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া আসিতে হইবে!

বিপিন সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ততার সহিত পকেট হাতড়াইতে লাগিল—সাড়ে তের পয়সা। সে সহর্ষে পাকস্থলী পরিপূরণের জন্ত

প্রস্তুত হইতে লাগিল। বগলা শুইয়া বলিল,—হয়ত আমার পকেটেও কিছু আছে—বিনোদের ছবির দশটা টাকা ত আদায় ক'রেছিলাম।

আহারাদি অন্তে বিপিন অফিসে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার মানসে জীর্ণ ছাতাটী লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। বগলার কাজ ছিল না, শুইয়া ক্রমাগত ভাবিয়া যাইতে লাগিল—

বিপিনের বিদায় লইবার শনিবার আসিয়া পড়িল। বগলা হ্যাট-কোটধারী সাহেব বিপিনকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া বিনোদ ও বিপিনের পরিত্যক্ত জীর্ণ মাদুর জুড়িয়া বিরাট এক ফরাস রচনা করিয়া পা ছড়াইয়া বসিল। একটা বিড়ি ধরাইয়া কড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল—আনন্দ কি দুঃখ ঠিক ভাবিয়া পাইল না। দুঃখ আনন্দের মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল—

সে যেন আজ বিস্তৃত উদ্দাম জলস্রোতবাহী এক নদীর তীরে বসিয়া! কত লোক বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে, কেহ বা ও-পারে যাইতেছে কিন্তু পারেও নহে, গৃহেও নহে, এমনি একটা স্থানে সে একাকী বসিয়া—যেখানে কোন আশ্রয় নাই।

রাত্রিতে ক্ষুধার উদ্রেক হইল; কিন্তু বাজার করিয়া আনিতে হয়। ভাবিল—থাক্ কাল হইতে আবার নূতন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করা যাইবে। চাকুরীর জন্য কাল সকলকে বলিয়া রাখিতে হইবে।

বগলা দেখিল,—ঘরের কোণে, স্বরূপার সেই কালী-অবলুপ্ত ছবিখানা, দুইটি তুলির হ্যাণ্ডেল, বিনোদের ছিন্ন পাঞ্জাবীর হাতাটা, বিপিনের দুই একটি কবিতা, বেহালার ছড়ের লাঠি একখানা, একজোড়া ছেঁড়া চটি এখনও রহিয়াছে। একবার ভাবিল ফেলিয়া দিবে, কিন্তু প্রয়োজন কি?

কোন ক্ষতি ত উহারা করিতেছে না। মনে মনে ভাবিল, শ্মশান জাগাইয়া বসিবার ভার কি তাহার উপরই রহিল!

ভোর রাত্রে শীত পড়িয়াছিল, বগলার ঘুম ভাঙিয়া গেল। গায়ে দিবার মত কিছুই নাই, পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া দেখিল শীত মানায় না। গত বৎসরের কম্বলটা কোন্ ভিখারীকে যেন দান করা হইয়াছিল। অকস্মাৎ উর্ব্বর মস্তিষ্কে নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইল, যেমন ভাবা তেমনি কাজ! বিপিন ও বিনোদের পরিত্যক্ত মাদুর দুইটি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল, বেশ শীত মানাইয়াছে। বগলা খুশী হইল—

কিন্তু বুকের মাঝে সেই বেদনাটা, যাহাকে অনভিজ্ঞ ডাক্তার প্লুরিসি আখ্যা দিয়াছিল, সেইটাই যেন আবার সুরু হয়। প্রতি নিশ্বাসে সূচের মত ফুসফুসের মাঝে ফোটে। পাঁজরার মাঝে হুঁকার মত গুড়গুড় করে। তা হোক,—শীত মানাইয়াছে ত? বগলা খুশী হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া বগলা ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিল। আপাততঃ কি করা যায়! এখন যখন প্রচুর অবসর তখন এই ফাঁকে পরীক্ষাটা দিয়া ফেলা যাক। হিসাব করিয়া দেখিল, উপন্যাসখানি যদি বিক্রয় হয় তবে, কি দেওয়া যাইবে—পুরাতন বন্ধুবান্ধবের নিকটে বই পাওয়া যাইবে—অতএব অন্তরায় আর কিছুই রহিল না।

পথে বাহির হইয়া দেখিল, নগদ ছয় আনা পয়সা বিদ্যমান। দোকানে চার পয়সার প্রাতরাশ ভোজন করিয়া একটি বন্ধুর বাড়ীতে হাজির হইল। পুস্তকাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলে বন্ধু বলিলেন,—বগলা too late বই কি এখনও আছে? সিনেমার পয়সার জন্য সব বিক্রি করে দিয়েছি, তা ছাড়া কিছু কিছু দানও ক'রেছি, এতদিনও কি আছে! তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু দিতে পারবো, আর ওই সুনীলের বাড়ী গেলে কিছু পাবি।

বগলা সুনীলের বাড়ী গিয়া বই চাহিলে, সুনীল বলিল,—হ্যাঁ ভাই, কিছু কিছু আছে,আর এদিক ওদিক ক'রে জোগাড় ক'রে দিতে পারবো। অন্ততঃ দু' চার দিনের জন্ম নিয়েও ত নোট ক'রে নিতে পারবি কিন্তু সেই কুড়ি টাকার ফিললজির বই দু' ভলুম ত মেরে দিয়েছি—

বগলা বলিল,—সে বইএর কি উপায় করা যায় বল ত?

সুনীল ভাবিয়া বলিল,—আমাদের দল ত আমার বই পড়েই পরীক্ষা দিয়েছিল। আর যাদের বই ছিল তাদের ত জানি না, কিন্তু হ্যাঁ, বুঝলি, একটা কাজ ক'রলে ও বই দুটো পাবি। মনে আছে, আমাদের সঙ্গে মিস্ সেন পড়তেন? তার ত নিশ্চয়ই বই দু'খানা আছে। তিন মাসের জন্ম বই দু'খানা নিশ্চয়ই দেবেন—আর তাঁরা ত আমাদের মত বই বিক্রি করেন নি, বুঝেছিস্, আজ র'ববার যা এক্ষুনি চ'লে। গিয়ে দেখবি—

বগলা সন্দেহের সহিত বলিল,—যদি না দেন, তা হ'লে—

—অপমান! কিছু না, জীবনে এক দিনের বেশী দু'দিন ত দেখা হবে না। আর ভাবিস্ নি; কুড়ি পঁচিশ টাকা আবার একটা টাকা, তাদের কাছে—ছোঃ! আলিপুরের নিউ রোডে গিয়ে দেখবি সে কি পেল্লয় বাড়ী! আর তারা খুব আপ-টু-ডেট্, ব্রাহ্ম। এডুকেশনের জন্ম সানন্দে সাহায্য ক'রবেন। ৮নং বাড়ী—গেট দরজার পাশে ট্যাবলেট দেওয়া।

বগলার আর কোন সন্দেহ রহিল না। যাঁহারা এত বড়লোক তাঁহারা নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। আলিপুর যাতায়াতে পাঁচ আনা বাস খরচ, বগলা ভাবিল, শুভস্য শীঘ্রং খাওয়া না হয় আজ না-ই হইবে।

বাসে চড়িয়া বগলা কল্পনা করিতে লাগিল—এই সমস্ত বই সহযোগে পরীক্ষা দেওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া এবং জীবনের অবলম্বন স্বরূপ একটা চাকুরী! চমৎকার জীবনযাত্রা, নিরবচ্ছিন্ন অবসরে সাহিত্য সাধনা! কি করিয়া

মিস্ শোভনা সেনের সহিত আলাপ করিতে হইবে, তাহারও একটা মহড়া মনে মনে দিয়া রাখিল।

বাসের কণ্ডাক্টর বলিল,—এই যে নিউ রোড বাবু।

বগলা নামিয়া দেখে প্রশস্ত রাস্তা। চারিপাশে প্রাসাদের সারি, সম্মুখে ফুলের বাগান। মাঝখানে দুইখানি সবুজ ঘাসে ঢাকা পতিত ভূমি, অধিবাসীগণকেও হয়ত এমনি শ্যামল সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। বগলা আনন্দে চারিদিকে চাহিতে লাগিল—কি সুন্দর মানুষ এরা! ৮নং বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল সুনীল যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নয়, বাড়ী সত্যই 'পেল্লয়'। বাড়ী সম্মুখে ফুলের বাগান, প্রস্ফুট পুষ্প-মঞ্জরী বাতাসে মাথা নাড়িতেছে, বগলা আরও আনন্দিত হইল, যাহারা এই এত বড় বাড়ী, এত আলো, এত বায়ু, আর ফুলের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের অন্তর বড় হওয়া ত খুবই স্বাভাবিক। বগলার অন্তর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

গেট-দরজা ভেদ করিয়া বৈঠখানায় ঢুকিয়া গেল। এক পার্শ্বে টেবিলে বসিয়া দুইটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আলাপ করিতেছেন। পাশে বিস্তৃত ফরাস পড়িয়া আছে। একজন বৃদ্ধ তাহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলে বগলা নমস্কার করিয়া কহিল,—আমি মিস্ শোভনা সেনের সঙ্গে একটু দেখা ক'রতে চাই।

—বসুন।

বগলা ফরাসের উপর বসিয়া রহিল। অন্য বৃদ্ধটি আলাপ সমাপন করিয়া উঠিল গৃহস্বামী বলিলেন,—কি জন্য?

বগলা কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—আমি তাঁর সঙ্গে পড়েছি, কিন্তু অসুখ-বিসুখে পরীক্ষা দেওয়া হয় নি, এবার দেব ভেবেছি তাই কিছু বইয়ের জন্য!

—কি বই ?

—ফিললজির দু'ভলুম বই—

—হুঁ, তার সঙ্গে ত দেখা হবে না, তার অসুখ। আর ও তার প্রাইজের বই সে দেবে না।

—না, তিন মাসের জন্য, পরীক্ষার পরই ফেরত দিয়ে যাব।

—আপনার সঙ্গে তার পরিচয় আছে ?

—না, পরিচয় ঠিক নেই, তবে তিনি দেখ্‌লে চিন্‌বেন আশা করা যায়।

বড় একটা যুক্তি পাইয়াছেন এমনি ভাবে বৃদ্ধ বলিলেন,—পরিচয় যখন নেই, তখন বিশ্বাস কি বলুন! কি ক'রে বই আর—

বগলা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে সমস্ত রকম প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কোন ভদ্রলোক তাহার সততায় এমন নগ্নতার সহিত সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন তাহা ভাবিয়া রাখে নাই। সে কি বলিবে বুঝিয়া পাইল না, বলিল,—হাঁ তা বটে কিন্তু তিন মাস পরে—

—না, না, সে সে-বই দেবে না। তার প্রাইজের বই আর তার সেটা প্রায়ই লাগে—

বগলা ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিল, 'সে দিবে না' তাহা ইনি কি করিয়া বুঝিলেন, দিবেন কিনা তাহা তাঁহাকে বলিতে দিলে ক্ষতি কি ? বগলা বলিল,—আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে তাঁর কাছ থেকে শুনে আমাকে বললে খুসী হবো, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—সে বেরিয়ে গেছে এখন। তা আপনার অন্যান্য ক্লাসফ্রেণ্ডের কাছ থেকে নিয়ে পড়বেন তা হ'লেই—

বগলা বুঝিল, এখানে আর আশা নাই ; অযথা বিনয় প্রকাশ করিয়া,

কি হইবে। একবার 'অসুখ' এবং একবার 'বেরিয়ে গেছে' এমন রকমারি কথার পরও আশা করিবে এমন মূঢ় কে আছে? বগলা একবার ভাবিল, বেশ কিছু শুনাইয়া দিয়া যায় কিন্তু দারওয়ান ও চাকরগুলির দৈহিক পরিধি দেখিয়া সাহস পাইল না।

বৃদ্ধ উপদেশ দিবার সুরে বলিলেন,—শুধু শুধু অনির্দিষ্টের পেছনে ঘুরে কি হবে, এবার যারা পরীক্ষা দেবে তাদের সঙ্গ ধরুন—

কিন্তু সঙ্গ ধরাটা যে কতদূর কঠিন তাহা ইনি জানেন না দেখিয়া বগলা হাসিয়া বলিল,—আপনার উপদেশে সত্যিই লাভবান হ'লুম—নমস্কার।

বগলা রাস্তায় আসিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বলিল,—এর কোন মানে হয়! ওই 'পেল্লয়' বাড়ীখানার মধ্যে যে নীচতা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহারই ভাঁপ্সা গন্ধে বগলার সমস্ত গা ঘিন্‌ঘিন্ করিতেছিল। বগলা ভাবিল, এই উদরান্নের জন্য সঞ্চিত পাঁচ আনার পয়সা ব্যয় করিয়া সে আজ যাহা শিখিয়াছে তাহা সংসারে সুদুর্লভ। বড় বাড়ী, বিপুল উদ্যান দেখিলে, তাহাদের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বগলা শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করিত; কিন্তু আজ সে দেখিল যে, এই বাড়ীগুলির মধ্যে জগতের সমস্ত ক্লেদ, নীচতা, মনুষ্যত্বের গ্লানি এমন ভীড় পাকাইয়া আছে যে এরা নিসংশয় নির্লজ্জের মত পরের সততায় সন্দেহ প্রকাশ করে—অর্থের মোহে, হৃদয়ের সুপ্রবৃত্তি মরিয়া, ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। সুনীল বলিয়াছিল, কুড়ি টাকা এঁদের কাছে টাকা! ছো!—শুধু টাকা তাহাই নহে, তাহার জন্য মিথ্যা কথাও বলা যায়—যাহাদের সত্য কথা বলিবার সাহস নাই তাহাদের মিথ্যা কথা বলিতেই হয়।

বাসে উঠিয়া বগলা পকেটের সব কয়েকটি পয়সা কণ্ডাক্টরের হাতে তুলিয়া দিল। সারাদিন কিছু আহার্য্য জুটিবে না জানিয়াও সে নিশ্চিন্ত

মনে বসিয়া রহিল—বাক্ পরীক্ষা দিতে হইলে অনেক শ্রম হইত, বাঁচা গেল।

ব্যারাকে ফিরিয়া বগলা তাহার এই পাঁচ আনার অভিজ্ঞতা উপন্যাসের আয়ুর সহিত অক্ষয় করিয়া রাখিয়া দিল।

বৈকালে ঘুম হইতে উঠিয়া বগলা অনাহার-জনিত দুর্ব্বলতা বোধ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বুকের বেদনাটাও বাড়িয়াছে—আজকার দিনে বিনোদ থাকিলে তাহাকে এই অসমর্থ দেহখানা লইয়া আহারের সন্ধানে বাহির হইতে হইত না।

বুকের বেদনাটা প্রতিনিয়ত, প্রতি নিশ্বাসে এমন ভাবে পীড়ন করিতেছে যে, তাহা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান কষ্টসাধ্য কিন্তু না খাইয়াই বা কতক্ষণ চলিবে?

বুকখানা চাপিয়া ধরিলে একটু বেদনা কম বোধ হয়, বগলা বিনোদের ছেঁড়া পাঞ্জাবীটার সাহায্যে বুকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বগলার কেবল রাগই হইতে লাগিল, আজ কাজের দিনেই শরীরটা এমন বিদ্রোহ করিয়া বসিয়াছে। এর কোন মানে হয়।

একটা পার্ক—

সম্মুখে স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছে, চারিদিকে একটা সজীব চঞ্চলতা। সকলেই প্রফুল্ল, ছুটাছুটি করিতেছে অথচ সে পারিবে না কেন? এ অন্যায়, সে উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিতে লাগিল। দুর্ব্বল দেহ, বেশীক্ষণ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না, বগলা চোখে অন্ধকার দেখিয়া একটা লাইট-পোষ্ট জড়াইয়া ধরিল।

আস্তে আস্তে চোখের ঘোর কাটিয়া গেলে, বগলা ভাবিল অনেকটা

সময় ও সামর্থ্য সে অপব্যয় করিয়াছে। সে আহার্য্য সংগ্রহের উপায় ভাবিতে লাগিল—হ্যাঁ কিছু যদি পড়িয়া পাওয়া যায় তবে হয়।

রাস্তার উপর কিছুক্ষণ পায়চারী করিল, কিন্তু কাহারও পকেট হইতে কিছুই পড়িল না, সকলেই আজ অনাবশ্যকরূপে সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে। বগলা হতাশ হইয়া পড়িল।

অদূরে একটি তন্বী তরুণী মহিলা আসিতেছিলেন। বগলা ভাবিল, ওঁর কাছে কিছু ভিক্ষা করিলে হয়, দেখা যাক্। নাঃ—নারীর কাছে! বগলা আবার হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

একটু পরেই ক্লান্তি আসিল। বগলা স্থির করিল, আর ছুটাছুটি করিয়া কি হইবে। বসিয়া বিশ্রাম করা যাক্,—ফুটপাথের একধারে বিরাট এক প্রাসাদের দেয়ালে হেলান দিয়া সে বসিয়া রহিল।

রাস্তা দিয়া কত লোক যাইতেছে, কাহারও চাহিয়া দেখিবার অবসর নাই, কত তরুণ তরুণী। সহসা একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায় এখানে ব'সে? ডোজ বেশী হ'য়ে গেছে বোধ হয়?

বগলা জবাব দিল,—আজ্ঞে না, আমি সি, এস, পি-এর অফিসার আপনাদেরই তদারক ক'রছি।

ভদ্রলোক ভাবার্থ গ্রহণ না করিয়াই হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আর একজন যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি এখানে ব'সে, অসুখ করেছে—

—হ্যাঁ, অসুখই ক'রেছে—তা ছাড়া—

বগলা আর বলিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ, নমস্কার।

তিলার্দ্ধও দেরী না করিয়া বগলা চলিতে লাগিল। যে দেহ এত ভঙ্গুর তাহারই প্রতিপালনের জন্য সে আজ ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

এই ভাবনাটাই ক্রমাগত তাহাকে কষাঘাত করিতে লাগিল। দুনিয়ার এমন করিয়া আর কতকাল দুয়ারে দুয়ারে হাত পাতিয়া ফিরিতে হইবে! বুকের বেদনাটা কেবলই বাড়ে, তাহা ত দেহকে সংজ্ঞাহীন অভিভূত করিয়া দিতে পারে না। বগলা অশক্ত পা দুটিকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিতে লাগিল। এই আত্ম-বিভ্রমের জন্য তাহার নিজের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল। দেহখানাকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেও যেন এ শোধ যায় না!

বন্ধুহীন অসহায় অবস্থাটি বগলাকে দুঃখিত করিতে পারে নাই, প্রতি-নিয়ত ক্রুদ্ধ করিয়াই তুলিতে লাগিল। পাশের কঠিন প্রাচীরে সমস্ত শক্তি দিয়া একটা ঘুবি দিল, খানিকটা চামড়া উঠিয়া গেল। বগলা খুশী হইয়া ভাবিল, যে দেহের এত ক্ষুধা, এত জীর্ণতা, সে দেহের এমন শাস্তি হওয়াই উচিত। এমনি করিয়া কতদিন আর চলিবে, কিন্তু যাই হোক ওই আভিজাত্যের দুয়ারে, যার দীনতার পরিচয় আজ সকালে স্বচ্ছ পদার্থের মত তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল, তার কাছে কোন মতেই আর হাত পাতা চলিবে না—এ মনুষ্যের অবমাননা, আত্মশক্তির অমর্য্যাদা।

সরু গলির মধ্যে কলেজের ছেলেদের মেস্! রবিবার সকালে চা সহযোগে বগলার বন্ধু প্রফুল্লর ঘরে আড্ডা বসে—হাসি-ঠাট্টা কলরবে থৈ থৈ করে। বেলা এগারটায় আবার ভাঙিয়া যায়। রাজনীতি, সমাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখের বাড়ীর স্কুলযাত্রী-ছাত্রীটির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও আলোচনা চলে।

প্রফুল্লর ঘরের অন্য অংশীদার কলতলা হইতে সাবানকাচা কাপড় স্কন্ধে ঘরের মাঝে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল। কোলাহল-কলরব

মুখরিত রবিবারের মুখর বৈঠক যেন সহসা অমাবস্যার মত ম্লান হইয়া গিয়াছে। একটা হাসির কথা মহলা দিতে দিতে আসিয়াছিল কিন্তু অবস্থা দেখিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

আড্ডার বড় পাণ্ডা, ধনী রমেশ বালিশ আশ্রয় করিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া। সদ্য কাচানো আদ্দির পাঞ্জাবীর ইস্ত্রী ভাঙিয়া যাইতেছে, ঘড়ির সোনার ব্যাণ্ড বুকের চাপে ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রফুল্লর ঘর-সঙ্গী সুধীর এমন অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ে বলিল—তোমাদের মুখ• পিন্‌-আপ ক'রে দিলে কে?

প্রফুল্ল ঘোর সেন্টিমেণ্টাল, বিশেষতঃ প্রেম সম্পর্কীয় ব্যাপারে সে একান্ত নিষ্ঠাবান, নারীজাতির প্রতি তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা। ক্রুদ্ধ হইয়া, বুরুশ করা জুতায় আরও দুইটী জোর ঘষা দিয়া বলিল,—রসিকতার স্থান-কাল-পাত্র আছে। অপোগণ্ড ঘণ্টাড়া কোথাকার। জানিস্‌ আমরা কতবড় একটা সমস্যার সমাধান পাচ্ছিনে আর তুই—ক্রোধের আবেগে বাক্যের সামঞ্জস্য হারাইয়া সে চুপ করিয়া গেল।

প্রফুল্লর 'ঘণ্টাড়া' ছিল কথার মাত্রা। সমবেত আড্ডার মাঝে প্রফুল্লর অহেতুক আক্রমণে ক্ষুণ্ণ হইয়া সুধীর বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিল,—স্থানের অভাব হ'ল কেন, গাড়ুটা কোথাকার—

প্রফুল্ল সন্ত্রাস করা একপাটি জুতা উদ্যত করিয়া বলিল,—গাড়ু ব'ললি?

'গাড়ু' গালাগালিটার একটু ইতিহাস ছিল। সুধীর ও প্রফুল্ল একদা তাস খেলিতে খেলিতে নিদারুণভাবে পরাজিত হইতে লাগিল। প্রফুল্ল কিঞ্চিৎ স্থূলবুদ্ধি, তাহার ভুল হইতেছিল। যথোপযুক্ত সাবধান করিয়া দিবার পরও নির্বোধ প্রফুল্ল একটি ভুল করিয়া ফেলিল, তখন ক্রুদ্ধ সুধীর গালাগালির উপযুক্ত কোন বিশেষণ না পাইয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলী

বলিয়া ফেলিল,—গাড়ু। ভদ্রমণ্ডলী অনেকক্ষণ হাসিয়া তিরস্কারের মৌলিকতা উপভোগ করিলেন। সেই দিন হইতে এই গাড়ু প্রফুল্লর অন্তরে শেলের মত মর্ম্মান্তিক হইয়া বিঁধিয়াছে।

জুতা মারামারি পর্য্যন্ত হইল না। প্রফুল্ল অধিক বলশালী, সুধীর রণে ভঙ্গ দিয়া বলিল,—কি হ'য়েছে, পরিষ্কার ক'রে বল্ না।

প্রফুল্ল ভূমিকা দ্বারা বায়ুমণ্ডল গম্ভীর করিয়া লইয়া বলিল,—বাস্তবিকই দুনিয়ার বিধাতার এ এক অবিচার, ভালবাসলে তাকে পাওয়ার পথে অশেষ বিঘ্ন। সত্যই, লীলা ও রমেশের অন্তরের পরিচয় যে কতবড় সত্য তা আর কেউ না জানলেও আমারা ত ভাল করেই জানি, কিন্তু এ প্রেমের আজ এমন পরিসমাপ্তি ঘটেছে যে তা রমেশের পক্ষে এখন দুঃসহ। এমন সমাজের ভাল হবে না, হতে পারে না।

সুধীর ভাবিল, এতবড় অভিশাপ যখন সমাজের উপর পড়িয়াছে তখন ব্যাপারটা জটিল—কারণ, প্রফুল্লর সনাতন হিন্দুসভ্যতার উপর আকণ্ঠ প্রেম তাহাকে উত্যক্তই করিয়াছে।

লীলা রমেশ প্রণয়-সত্যটা এই—

রমেশের বাড়ী শ্রীরামপুর। বসবাস সেখানেই। রমেশ অনেক টাকা ও কলিকাতার কয়েকটি বাড়ীর একমাত্র মালিক, অভিভাবকহীন সাবালক। শ্রীরামপুরের পার্শ্বস্থ বাড়ীর সুন্দরী এক কুমারী নিত্যই গাড়ীতে স্কুলে যাইত—সে-ই লীলা। যথাক্রমে উভয়ের পরিচয়, পূর্ব্বরাগ এবং প্রণয় হয় কিন্তু পরিচয়ের কোঠায় আসিয়া সব চুরমার হইয়া গিয়াছে; কারণ, লীল' সনাতন-পন্থী ব্রাহ্মণকন্যা ও রমেশ বৈদ্য। এখন অবস্থা আশঙ্কাজনক, লীলার এলোকেশের প্রতি দৃষ্টি নাই, নিশীথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের কোণে কালির প্রলেপ পড়িয়াছে। আর রমেশ! নোঙর-ছেঁড়া-নৌকার মত উদাসভাবে কচুরীপানাকেও উপেক্ষা করিয়া ভাসিয়া

চলিয়াছে। অসবর্ণ বিবাহে লীলার পিতার অনুকূল মতামত সৃষ্টির জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে বৃদ্ধের ধর্ম্মভয় কোন প্রকারেই প্রশমিত হয় নাই।

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া প্রফুল্ল বলিল,—সে বুড়ো নাকি আবার ব'লেছে এক আর দুই যেমন চার হয় না, এও তেমনি হয় না—অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহ বিবাহ অভ্রান্ত অসত্য।

বগলা একরাশ উস্কখুস্ক চুল লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—কে ব'ললে হয় না, ছোটকালে অমন কতবার চার করে দিয়েছি। গোঁজামিল দিয়েই ত পাশ ক'রেছি—আর সাবালক হ'য়ে কি পারবো না? ব্যাপার কি?

প্রফুল্ল সবিস্তারে সমস্যা জ্ঞাপন করিল। বগলা হাসিয়া বলিল,—হস্তীমূর্খের দল! এ আবার একটা সমস্যা! মেয়েদের ভালবাসা ঝড়বৃষ্টির মত প্রবল এবং ক্ষণস্থায়ী, ওতে আমার বিশ্বাস নেই, দুদিনে সে-লীলা সব ভুলে যাবে। তবে এই সমস্যা,—রমেশ বৈদ্য; আমি বিশুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে মন্ত্রক'টা আমি পড়ে দিতে পারি। তারপরে রমেশ অনায়াসে তার ন্যায়সঙ্গত পত্নীকে ধর্ম্মপত্নী ক'রে নেবে। সমাজের আইনকে একটু ফাঁকি, এই মাত্র,—

প্রফুল্ল টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল,—আলবৎ নেবে, কেন নেবে না? যে সমাজ এত সংকীর্ণ হৃদয়ের মর্য্যাদা রাখে না, তাকে অমর্য্যাদা করাই ধর্ম্ম।

বন্ধুগণও সন্তোষে প্রফুল্লর মতামত অনুমোদন করিলেন।

সুধীর বুদ্ধিমান। বাজে কথায় আস্থা নাই, বলিল,—মুখের বড়াই রেখে দাও বগলা, তুমি কি সত্যই পারো?

বগলা ওষ্ঠ বিকৃত করিয়া বলিল,—অনায়াসে, নিঃসঙ্কোচে, নিঃসংশয়ে কারণ ত্রিজগতে আমার কাজের কৈফিয়ৎ নেবার জন্য কেউ বেঁচে নেই, তবে তার দক্ষিণা চাই।

—কি দক্ষিণা ?

—রমেশ বড়লোক, বড়বাড়ী তার একতলায় একটা ছোটঘর ছেড়ে দেবে, খেতে দেবে এবং মাসিক আট টাকা হাতখরচ দেবে, অবশ্য আমার চাকুরী হ'লে আমি অমনি বিদায় নেব।

লীলার বিনিময়ে, রমেশের কাছে এ অতি তুচ্ছ। কথাটা আলোচনার গুরুত্ব লাভ করিল। রমেশও উঠিয়া বসিল। সভায় জলযোগ হইতে প্রস্তাব হইল,—লীলার এই ব্যাপারে সম্মতি আছে কিনা আগে জানা প্রয়োজন।

সুধীর বলিল,—বগলা সময়কালে কিন্তু পিছিয়ে প'ড়ো না। কাজটা ভেবে দেখো।

বগলা বলিল,—এ তুচ্ছ কাজের জন্য ভাববার আবশ্যকতা নেই।

সভা-ভঙ্গের পর বন্ধুগণ প্রস্থান করিলেন, প্রফুল্ল বলিল, বগলা কিন্তু সত্যই পারে। এ বিশ্বাস আমার আছে, ওর বুকে অসীম সাহস।

সুধীর বলিল,—হবে !

প্রফুল্ল বলিল,—এমন হওয়াই উচিত। এ সমাজ ধ্বংস হ'য়ে যাক্—আজ যদি রমেশ আফিং খেয়ে মরে তবে সে দোষ কার ? অবশ্যই সমাজের।

সোমবারে সন্ধ্যায় সমবেত বন্ধুগণের সম্মুখে রমেশ গর্ব্বোন্নত বুকে একখানি লিপি দাখিল করিল। লীলার লেখা—

প্রিয়,

তোমার জন্য আমি যে কি দিতে পারি আর না পারি, তা শুধু বিধাতাই জানেন। তুমি যাহা প্রস্তাব করিয়াছ তাহার পরিণাম সম্বন্ধে

তোমার উপরেই নির্ভর করিব, তবে আমার দিক দিয়া উহা খুব সুসাধ্য। কে এমন মহৎ তোমার বন্ধু, তাহাকে জানি না, আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার তাহাকে জানাইও—আমার চোখের জলের এতবড় মূল্য যিনি দিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার। ইতি—লীলা

প্রফুল্ল পত্র পাঠ করিয়া বগলার দিকে চাহিল। বগলা উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল কোনই উত্তর দিল না। সুধীর বলিল,—কি হে, বগলা, বাক্‌রোধ হ'ল নাকি ?

বগলার বুকের বেদনা বাড়িয়াছিল, বাম হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এখনও হয়নি, তবে জোগাড় হ'য়েছে—

—তোমার মত কি ?

—মত আবার কি ? বিয়ের দিন ঠিক কর তাড়াতাড়ি, আমি দুদিন বিশ্রাম করি।

প্রফুল্ল বিজয়োল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল।

রমেশ বলিল,—তোর কি হ'য়েছে ?

—কি জানি ভাই, এখানটায় ব্যথা, ডাক্তারে বলে প্লুরিসি না কি ছাই।

সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া ব্যথিত ভাবে চুপ করিল।

বগলা বলিল,—ভাই যে রকম দেখছি, এখন তোর শুভবিবাহটা দেখে যেতে পারলে হয়।

তিন চারদিনের মধ্যেই বগলা ব্যারাক হইতে সুটকেসটা লইয়া রমেশের একখানা বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। দাস দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল, মেয়ে দেখাও সুরু হইয়া গেল। বগলা আনন্দেই এতবড় একটা বাড়ীর অধীশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

অকস্মাৎ একদিন রাস্তায় সুনিলের সহিত দেখা। সুনীল জিজ্ঞাসা করিল—পরীক্ষা ত দেওয়া হ'ল না, কি ক'রছিস আজকাল?

—অভিনয় ক'রছি—

—কোন্ ষ্টেজে?

বগলা বলিল—প্রাইভেট ষ্টেজ।

সুনীল বলিল শুনেছিস্ মিস্ সেন বিমলা গার্লস স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস হ'য়েছেন!

—হওয়াই উচিত।

—মানে।

—না হ'লে যে মেয়েরা হৃদয়বতী হ'য়ে উঠতো?

সুনীল কিছু না বুঝিয়াই খানিকটা হাসিয়া রইল।

আরও কয়েকদিন পরে অঘ্রাণের এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে বগলার সহিত লীলার শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

কথা হইল—বগলা একলা, সুতরাং বিবাহের পর বধূসহ প্রস্থান করিয়া সত্বরই বধূ পাঠানো সম্ভব হইবে না। জামাতার কষ্ট নিবারণার্থে শ্বশুর মহাশয়ও রাজী হইয়াছেন শাশুড়ী নাই, তাঁহার মতামতও তাই প্রয়োজন হয় নাই।

বগলা বধূসহ গাড়ীতে উঠিয়া রওনা দিল। কিছুক্ষণ গাড়ী চলিবার পর বগলা বলিল—নমস্কার। লীলা হাসিয়া ক্ষুদ্র একটু নমস্কার জানাইল।

—আপনাকে যে কি ব'লে ডাকবো তাই খুঁজে পাচ্ছিনে।

—যা খুশী।

আমার খুশীমত হ'লে ত হয় না, আপনারও ত প্রীতিকর হওয়া চাই যদি বলি হাতী, আপনি অবশ্যই চ'টে যাবেন—হ্যাঁ, গঙ্গাজল ব'ললে হয় না!

লীলা হাসিয়া বলিল,—তাও হয়।

আরও কিছুক্ষণ নীরবেই চলিয়া গেল। লীলা হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আপনি থাক্‌বেন কোথায়?

—আপনাদেরই বাড়ীর একতলার একটি ঘরে।

লীলা চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বগলা তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল—সুন্দরী বলিলে সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকে প্রচুর মর্য্যাদা দেওয়া হয় না।

লীলা হঠাৎ বগলার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল, বগলা হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—সর্ব্বনাশ! করেন কি? ছিঃ ছিঃ—

—আপনি আমার জন্য যে ত্যাগ ক'রেছেন,জগতে আর কেউ ক'রেছে কিনা জানি না, কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো?

—কৃতজ্ঞতা জানানো ভুল হবে! ওটা ত্যাগ নয় মোটেই,নির্জ্জলা স্বার্থ।

আপনি মহৎ।

বগলা হাসিয়া বলিল,—হয়ত তাই, ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে।

গাড়ী থামিল। রমেশ দরজা হইতে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। রমেশের সঙ্গে সঙ্গে লীলার ক্ষীণ দেহলতা সিঁড়ির উপর মিলাইয়া যাইতে লাগিল। বগলা হাসিয়া বলিল—গঙ্গাজল, নমস্কার!

লীলা ফিরিয়া নমস্কার জানাইল।

সিঁড়ির পাশেই তাহার ঘর। বগলা আপন মনে হাসিয়া নিজের ঘরের সমগ্র বিছানাটার উপর দেহ এলাইয়া দিল—যেন গুরুতর পরিশ্রমের পর অঙ্গ ঢালিয়া সে বিশ্রাম করিতেছে।

বেলা অপরাহ্ণ। পশ্চিমের জানালা দিয়া এক ঝলক রৌদ্র মেঝের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

বগলা ভাবিতেছিল,—তাহারা তিন বন্ধু, বিভিন্ন তিনদিকে অকস্মাৎ কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাদের জীবনের পরিসমাপ্তি কি জানি কেমন করিয়া হইবে। বিনোদ অনুকে লইয়া সংসার করিতেছে, শান্তি হইয়াছে রক্ষক। বিপিন সমস্ত শক্তি লইয়া নামিয়াছে জীবন-সংগ্রামে, হয় এ পার না হয় ওপার। বগলা বয়স হিসাব করিয়া দেখিল—ছাব্বিশ। জীবনটার অনেকখানিই ত বাকী। প্লুরিসি! যদি সেই ডাক্তারের কথাই সত্য হয়, তবে ?—ভাবনার কিছুই নাই, আজকাল যক্ষ্মা হাসপাতাল ত হইয়াছে!—বগলা অবেলায়ই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে লীলা খাইতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে হইল বগলা খাইয়াছে ত ? ঝি জানাইল—কি জানি, ওর স্বভাবের কিছুই বোঝা যায় না। সকালে চা দিয়ে এলুম—দেখি ঘুমিয়ে। ন'টায় কাপ আনতে গিয়ে দেখি, চা যেমন ছিল তেমনি আছে, রুটি খেয়ে বেরিয়ে গেছেন। বারটায়ও ফেরেন নি—

একটু সঙ্কোচ আজন্ম সংস্কারের জন্যই আসিয়া দেখা দিল—উনি খাননি। লীলা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখে, বগলা ধুলা-পায়েই বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে—বুকের উপর একখানা বই—

ডাকিবে ভাবিল কিন্তু কিরূপেই বা ডাকা যায়। একখানা ভারী বই লীলা মেঝের উপর ফেলিয়া দিল। বগলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

লীলা হাসিয়া বলিল,—খাবেন না ?

বগলা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—হেঁ,—এ্যাঁ, খাইনি ত, সে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। চলুন—

লীলা হাসিয়া বলিল,—ক্ষমা চাইবার কিছু হয়নি। স্নান ক'রলেন না

অনিচ্ছাকৃত একটি ত্রুটির জন্য বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বগলা বলিল,—না, না, অযথা দেরী হবে, বিকেলে ক'রবো এখন।

—আপনি সত্যই অদ্ভুত।

বগলা নিষ্কৃতি পাইয়া বলিল,—সে কথা আমি খুব স্বীকার করি গঙ্গাজল, তবে ওটা আমার কাছে একেবারেই স্বাভাবিক।

লীলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, এই এমন করিয়া অতি দীন ভিখারীর মত ক্ষমা তিনি কেন চান? সহানুভূতিতে তাহার চোখ দুইটি ভিজিয়া উঠিল।

বগলা শশব্যস্তে খাইয়া অপরাধীর মত ফিরিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিল, সত্যই যাহাদের আশ্রয়ে আছি, তাহাদের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া চলিতে হইবে বৈ কি? আশ্রিতের আব্দার শোভা পায় না। মনে মনে ঠিক করিল, খাওয়াটা অন্ততঃ ওদের সঙ্গেই শেষ করিতে হইবে।

রমেশ বাহিরে গিয়াছে। বৈকালে ফিরিবে।

লীলা তিতলের সাজানো ঘরখানায় একখানা সোফায় বসিয়া ভাবিতেছে—লোকটা একেবারেই অদ্ভুত! নিজের দেহের দিকে চাহিবার অবসর নাই। এঁর অন্তরকে ত কোন মতেই ছোট বলা যায় না, যে এত বড় দান হাসিমুখে করিতে পারে, তাহাকে ছোট ভাবিয়া অপমান করা কোন বিবেক-বুদ্ধির বিচারেই সঙ্গত মনে হয় না। ওর অন্তরে কে জানে কিসের দাবদাহ ওকে এমন মরিয়া করিয়া তুলিয়াছে। নিজের বিবাহিত পত্নীকে এতটুকু আপনার করিয়া লইবার প্রয়োজন ওর নাই! নিজের একটু ত্রুটির জন্য, নিজেরই স্ত্রী, হোক সে যেমনই,—তার কাছে অমন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করা—এতে সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, বিকার নাই। ওর অন্তর হয়ত আমরা যেমন করিয়া ভাবি তেমনি করিয়া ভাবিতে পারে না।

ভাবিয়া ভাবিয়া লীলা স্নেহ-করুণ অন্তরে একটু বেদনা অনুভব করিল। এই নীচে থাকা, সেখানে উপরের কলগুঞ্জন না যায় এমন নয়, অথচ—

লীলার আপনার ভাই ছিল না। শ্বশুর গৃহে আসিবার পর বৃদ্ধ পিতা আসিতে পারেন নাই, আজ অকস্মাৎ তাহার খুড়তুত ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটির বয়স পনর ষোলো, স্কুলের ছেলে। বগলাকে নীচের ঘরে বিশৃঙ্খল বিছানার উপর শুইয়া থাকিতে দেখিয়া ছেলেটি বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—আপনি এখানে শুয়ে যে! দিদি কোথায়?

এই বিপুল প্রাসাদের অধীশ্বরকে এক তলায় চাপাতলার খাটে শুইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবারই কথা!

বগলা সহাস্যে বলিল,—এসো, এসো, আরে সর্ব্বনাশ! তোমার আগমন, আহা!

—যা-ন্, আমি এক্ষুনি যাব,—দিদি কোথায় বলুন।

—ওপরে।

—আপনি যে এখানে?

—ছেলেমানুষ, বুঝবে না, কাল থেকে অভিমান চ'লছে—ব'সো ব'সো খবর দিয়ে আসি। মনে মনে বলিল আজকাল কিন্তু বেশ অভিনয় ক'রছি, না?

ছেলেটি বসিল।

উপরে লীলা ও রমেশের মৃদুগুঞ্জন, একটু তামাসার হাসি সিঁড়ির শেষটায় আসিয়াও পৌঁছিতেছিল। বগলা উপরটা ভাল করিয়া দেখে নাই, উঠিতে কেমন একটা দ্বিধা-সঙ্কোচে পা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। আবির্ভাবটা যেন কত বড় অপ্রীতিকর হইবে!

চটিতে যথাসাধ্য শব্দ তুলিয়া দোতলা পর্য্যন্ত উঠিয়া গেল। কান

পাতিয়া শুনিল,কোন্ ঘরটী ! ঘরের চৌকাঠে পা দিয়া ডাকিল,—গঙ্গাজল, আপনার ভাইটি দেখা ক'রতে এসেছেন—ওপরে পাঠিয়ে দেব ?

লীলা অপ্রতিভ হইয়া প্রথমটা কিছু বলিতেই পারিল না। ক্ষণিক পরে বলিল,—দিন !

রমেশ কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল। ভ্রাতা-ভগিনীর সাক্ষাৎও নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইল।

ভ্রাতার প্রস্থানের পর রমেশ আসিয়া দেখে লীলার মুখখানী যেন কেমন শাদা হইয়া গিয়াছে। রমেশ বলিল,—বাড়ীর সব ভাল ত ?

—হুঁ, ও কি ভেবে গেল বল ত ? বগলাবাবু নীচে শুয়ে ?

রমেশ চিন্তান্বিত হইয়া বগলাকে ডাকিয়া পাঠাইল। বগলা অপরাধীর মত দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,—আমায় ডেকেছ, রমেশ ?

—হ্যাঁ,—আয় না ভিতরে, ব'স এই চেয়ারটায়।

বগলা বসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল,—ও এসে কি জিজ্ঞাসা ক'রলে ?

বগলা হাসিয়া জবাব দিল,—ও, তার জন্ত তোমার এতটুকুও ভাবনা নেই। আর গঙ্গাজলের ভাইটির দেখছি, কার কোথায় শোওয়া উচিত সে বিষয়ে জ্ঞান যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ ক'রেছে। আমার নীচে থাকবার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে—

লীলা কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া শুধাইল—কি ব'ললেন ?

—ব'ললুম, ছেলেমানুষ তুমি ওসব বুঝবে না, অভিমান চ'লছে। কিন্তু তিনি যে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম ক'রেছেন এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই।

লীলা লজ্জিতা হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল এবং রমেশ চিন্তান্বিত হইয়া মুখখানা অপ্রাকৃত গাম্ভীর্য্যের আতিশয্যে অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিল।

বগলা বলিল,—কি রে রমেশ, ভাবছিস, আজ না হয় গেল কিন্তু

একদিন ত ব্যাপারটা প্রকাশ পাবেই, তাই ভয় হ'চ্ছে—না? কিচ্ছু ভয় নেই; আমি থাকলে ঠিক চালিয়ে নেব, শুধু দারোয়ানকে ব'লে রেখো, পরিচয় নিয়ে উপরে খবর দিয়ে তবে দর্শনেচ্ছুকে আসতে দেবে। বাড়ীতে যদি থাকি আদর যত্নের ত্রুটি কখ্‌খনও হবে না, আর যদি বাড়ীতে না থাকি তবে ব'ললেই হবে,—গার্ডেনে বেড়াতে গেছে। যদি চ'লেই যাই, পশ্চিমে গিয়ে মৃত্যু সংবাদ প্রচার ক'রলেই হবে। ব্যাপার অতি সরল—

রমেশ অনেকটা স্বস্তির সুরে বলিল,—তোর কাছে ত সবই সরল!

বগলা চলিতে চলিতে বলিল,—কারণ, আমি জগতটার অনেকখানিই স্বচ্ছ-পদার্থের মত দেখতে পাই কিনা?

লীলা হঠাৎ বলিল,—শুনুন।

পিছন ফিরিয়া বগলা বলিল,—আমাকে?

লীলা হাসিয়া জানাইল,—হুঁ, আপনি ওপরের একটা ঘরেই থাকুন না কেন? আমি টাকা দিচ্ছি, আপনি কিছু কাপড়-জামা···রমেশের দিকে ফিরিয়া বলিল—তুমি যাও না ওর সঙ্গে তোমারও ত জামা তৈরী ক'রতে হবে?

বগলা বলিল,—আপনারা আমাকে যে দান ক'রেছেন তাই শোধ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে শেষ করা যায় না। তার ওপর আর পড়লে ঘাড় ভেঙে যাবার সম্ভাবনাই অধিক। আমি দিব্যি রাজার হালে আছি—

—দান নয় এ মোটেই,—লীলা জবাব দিল—উপহার ব'লেই কি গ্রহণ করা যায় না?

—যার জামা নেই, তাকে একটা জামা উপঢৌকন হিসাবে পাঠাতে যাওয়ার অর্থ একটাই হয় গঙ্গাজল। বগলা দ্রুতপায়ে নীচে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

আজ তাহাকে যত বড় অপমান মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে, তত বড় অপমান এ জগতে অন্ততঃ বগলাকে কেহ করে নাই। উপবাসে, অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় জীবনের অনেকদিনই গিয়াছে সত্য, কিন্তু, আজিকার এই দান! যে চোখ দুইটি উপবাসের পর ভিজা চাল খাইয়াও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এত সৌভাগ্যের মধ্যেও সে দুইটি অবাধ্যের মত ব্যথার জলে ভরিয়া উঠিল। এ আত্মশক্তির অপব্যয়—এমন আশ্রিতের মত থাকা!

ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতে লাগিল, গঙ্গাজলের নিজের আত্মরক্ষার জন্ত তাহার বেশভূষা প্রয়োজন, নইলে তাহার আত্মীয়-সকাশে তাহাকে লজ্জিত হইতে হয়। বগলার ভিজা-চোখে আনন্দের আভাষ সন্ধ্যাতারার মত জল জল করিতে লাগিল। নারী-চরিত্রের যে অধ্যায়টা সম্বন্ধে তাহার একটু সংশয় ও সন্দেহ চোখের সম্মুখে কুয়াসার মত ঝাপ্সা হইয়া থাকিত, সেই অধ্যায়টাই আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। মনের মধ্যে ক্ষোভ, দুঃখ কিছুই রহিল না।

কিছুদিন চলিয়া গেল—

বগলা নীরবে ঘরেই থাকে। নূতন একখানা উপন্তাস আরম্ভ করিয়াছিল, মাঝে মাঝে তাহাই লেখে, যখন লিখিতে ইচ্ছা করে না তখন বিড়ি খাইয়া খাইয়া ঘরখানাকে ধূম-মলিন করিয়া তুলে। শুইয়া শুইয়া অবিশ্রাম ভাবিয়া চলে। জীর্ণ ছাতাটী মাথায় দিয়া কখনও রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে, যতক্ষণ পা চলে ততক্ষণ হাঁটে, ক্লান্ত হইলে রেস্তোরাঁয় চা খায়।

লীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ বিশেষ ঘটে না, ঘটিবার প্রয়োজনও সে উপলব্ধি করে না। যেটুকু চাহিয়াছিল সেইটুকু লইয়াই খুশী। মাসে মাসে লীলা খবর লইয়া যায় দুই একটা কথা—রাস্তায় দেখা-হওয়া দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মত। বগলা হাসিয়া গঙ্গাজলকে অভ্যর্থনা করে, গঙ্গাজল

নির্ব্বাক হইয়া যায়, বগলার অবান্তর কথাস্রোতের মাঝে কিছুই বলি উঠিতে পারে না। গঙ্গাজলকে বিদায় করিয়া দিয়া বগলা ভাবে, রমেশের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে আসামী না হইতে হয়! সেজন্য সাবধান হওয়া আবশ্যক। মানুষের জীবনটা ত ব্যবসায় ছাড়া কিছুই নয়, নীতির বাজারদরে চলা চাই।

সারাদিন রৌদ্রে ঘুরিয়া বৈকালে স্নান করিতেই হি হি করিয়া কাঁপাইয়া বগলার জ্বর আসিল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের নিকটে বেদনা, প্রতি নিশ্বাসে খচ্ খচ্ করিয়া ফোটে। বগলা বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিল,—এখন যদি চৈতন্য বিলুপ্ত হইত তবে সেই অনুভূতিহীনতা আমাকে নিষ্কৃতি দিয়া, কেমন রহস্যজালের মতই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিত?

বগলার ব্যাধির খবরটা দোতলায় পৌঁছাইল রাত্রি নয় ঘটিকায়। লীলা ও রমেশ দেখিতে আসিল।

লীলা বুকে হাত দিয়া বলিল,—বেদনা কোথায়?

বগলা চোখ মেলিয়া বলিল,—ও আপনি? আপনার আসবার ত দরকার ছিল না। ব্যথা বিশেষ কিছুই না, ডাক্তারে বলে প্লুরিসি না কি। দুদিন বাদেই সেরে যাবে। বরং ওপরে গিয়ে গান করুন, আমি নীচে থেকে শুনে সুখী হ'ব।

লীলা চিন্তান্বিত হইয়া বলিল—প্লুরিসি ত বড্ড খারাপ অসুখ, আপনি এতদিন বলেন নি, এতে যে—

—বাঁচে না? নাই বাঁচলো, তাতে ক্ষতি কি? চিরদিন বেঁচে থাকবো, এমন আশা করি না, দুদিন আগে আর পরে। এর জন্য ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আর আমার সব চেয়ে

অভ্যাস এই যে, আমার অসুখের সময় মানুষ কাছে এলে ভয়ঙ্কর রাগ হয়।

লীলা হাসিয়া বলিল,—আর কেউ হ'লে কথাটা বিশ্বাস ক'রতুম না, কিন্তু আপনার কথাটা অবিশ্বাস করি না। তাই বলে দু'একবার ভদ্রতার খাতিরেও ত আসতে হবে! সে বিরক্তিটুকু সহ্য ক'রতে হবে বৈ কি?

—তা হবে বৈ কি! এই ত একবার হ'ল, দ্বিতীয়বার কাল সকালে হ'লেই হবে। আর পরের জন্য নিজের সুখশান্তির লাঘব করা একেবারেই নির্ব্বুদ্ধিতা। আমার জন্য আপনাদের কষ্ট হবে, এ আমি সহ্য ক'রতে পারিনে। আর এতে আমার মোটেই দুঃখ হয় না।

রমেশ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। বগলার অস্বাভাবিক কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—চুপ কর, উপন্যাসের বুলি আওড়াতে হবে না। লীলা, কাল ডাক্তারকে ব'লে যাবো,—এলে তুমি ভাল ক'রে দেখিও।

বগলা বলিল,—রমেশ, তুমি টাকা পয়সা রাখতে পারবে না ব'লছি। অযথা অর্থের অপচয় ক'রো না। তোমার সঙ্গে ত ডাক্তার দেখানোর চুক্তি ছিল না।

রমেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল,—তুই ছোটলোক, এতটুকু মন নিয়ে তুই আর নিজেকে অপমান করিস্ নে। আমার যা খুশী ক'রবো—

বগলা মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—ক'রো তাতে আপত্তির কোন হেতু নেই, তবে আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারবে না। তোমার বাড়ীতে আছি, জ্বালাতন কর, থাকবো না।

বেশ কিছুক্ষণ দুই বন্ধুর বচসা হইল। লীলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সবই শুনিল। বগলা বুক চাপিয়া ধরিয়া কথা কহিতেছে, মাঝে মাঝে ম্লান

একটু হাসি। লীলার চোখ দু'টি অকারণেই জলে ভরিয়া উঠিল,—বাঁচিয়া উঠিবার বিরুদ্ধে ক্রমাগত এমন প্রতিবাদ জানানো—

লীলা বলিল,—জগতে কি আপনার কেউ বেঁচে নেই ?

বগলা তেমনি হাসিয়া জবাব দিল,—না গঙ্গাজল। জীবনটার আগাগোড়া চৈত্রের ধূসর মাঠের মত, মাঝে মাঝে পরিচিত মুখগুলি যেন শুষ্ক কাশের ঝোপ—

রমেশ ক্রুদ্ধ হইয়া এবং লীলা তাহার সজল চোখ দুইটির ভার লইয়া প্রস্থান করিল।

সকালে উষ্ণ চা এবং সিদ্ধ ডিম খাইয়া বগলা অনুভব করিল, তাহার বেদনাটা আর যেন নাই। গায়ে মত্ত হস্তীর বল নাই হোক, অন্ততঃ মত্ত শৃগালের বল যে হইয়াছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। বগলা সকাল সাতটায় ছাতা কাঁধে করিয়া প্রফুল্লর মেস উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

শহরের আবর্জ্জনা কাঁধে করিয়া ঘোড়া চলিয়াছে, তাহার উপর মানুষ। নিত্য দেখা এই দৃশ্যটার মাঝে বগলা আজ অনেক দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—শৃগালের স্কন্ধে শৃগাল উঠিয়া কাঁটাল খাইয়াছিল, শিশুকালে সে তাহার বুদ্ধির তারিফ করিয়াছিল,—আজও সে বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারিল না। শৃগাল একটু বোকা। মানুষের মত বুদ্ধি থাকিলে, কাঁটালটা নীচে না ফেলিয়া শীর্ষস্থ শৃগালই ভক্ষণ করিত—অথবা পশু কাঁটালের ভাগ না পাইয়া নীচু হইতে দৌড় দিত, উপরের সমস্ত শৃগাল ঢপ্‌ ঢপ্‌ করিয়া পড়িয়া যাইত। মানুষ পশু নয় তাই দৌড় দেয় না। বগলা সভ্যতাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল। ও মানুষের মন কি উদার! মাথায় বসিয়া কাঁটাল খাইলেও চোখে পড়ে না, চোখ দু'টা নীতির আবরণে এমনি ঝাপ্সা!

সকাল দশটায় রমেশ ডাক্তারসহ বগলার ঘরে ঢুকিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল!

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—রোগী?

রমেশ সভয়ে বলিল,—পালিয়েছে।

ডাক্তারবাবু বয়সে প্রবীণ। এইরূপ অপরিপক্ক যুবকের হেতুহীন রসিকতায় বয়সের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। সরোষে বলিলেন,—রোগী পলাতক? ঠাট্টা নাকি মশাই? ডাক্তারবাবু রোষ বিস্ফারিত চোখের ভাঁটা বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল—সহসা যেন কাশীপুরের বারুদের স্তূপে আগুন লাগিয়াছে!

রমেশ বিনীত কণ্ঠে বলিল,—আপনি রোগীকে জানেন না, জানলে বিশ্বাস ক'রতেন।

প্রবীণ ব্যক্তি তাহার স্বোপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার বাহিরে কিছু বিশ্বাস করেন না, তাই পম্পিয়াই ধ্বংসের মানসে ভিসুভিয়াসের তরল লাভা উদ্গার সুরু করিলেন,—মশাই বাড়ীর ওপর ভদ্রলোক ডেকে এনে এমন অপমান, ডিফামেসন সুট হবে—একটা বয়সের মর্য্যাদাও ত আছে! বয়সে বাপের বড়—

একতরফা বচসায় ডাক্তারবাবু মেয়েদের মত পটু, উচ্চকণ্ঠে এই অসঙ্গত ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে করিতে পার্শ্বস্থ চেয়ারটায় বসিয়া পড়িলেন। ঝি, চাকর, দারওয়ান দরজার কাছে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। রমেশ তাঁহাকে যতই বুঝাইতে চায়, তিনি ততই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। চাকর-বাকরের সম্মুখে রমেশ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

জীর্ণ ছাতা স্কন্ধে বগলা ঘর্ম্মপ্লাবিত কপাল হইতে ঘাম মুছিয়া, দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া এমন একটা হাঙ্গামা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেল।

রমেশ পরিত্রাণের উল্লাসে অভ্যর্থনা করিল,—এই যে, এই যে এসেছে বগলা, এই ডাক্তারবাবু।

বগলার আগমনে ডাক্তারবাবু স্টেথিস্কোপ শাণিত করিয়া লইলেন। এতগুলি লোকের সাক্ষাতে ডাক্তারের পরীক্ষা ও জেরায় বগলা বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষান্তর বলিলেন—হরিবল্! আপনার প্লুরিসি হ'য়েছে, সিরিয়স্ টাইপের। পরিশেষে মস্ত বড় একটা ঔষধের ফর্দ্দ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

রমেশ রাগান্বিত হইয়া বলিল,—কি অপমানটাই হ'লুম, কোন্ আক্কেলে তুই সকালে বেরিয়েছিলি বল্ ত?

বগলা মৃদু হাসিয়া বলিল—কোন্ আক্কেলে ডাক্তারকেই বা ডাক্‌লে?

—চোখ না থাকলে সে ত দেখতেই পায় না—বলিয়া রমেশ দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

বৈকালে লীলা আসিয়া বগলার শিয়রের কাছে চেয়ারটায় বসিয়া বলিল,—কেমন আছেন?

—বেশ।

—ব্যথাটা ক'মেছে?

—নেই ব'ললেই হয়।

—কিন্তু সকালে অমন ক'রে কেন বেরুতে গেলেন? বাড়ীশুদ্ধ লোক অপ্রস্তুতের একশেষ!

বগলা অপরাধীর মত বলিল,—সে অন্যায় হ'য়েছে, ক্ষমা করুন, এমন আর—

লীলা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল,—এমন করিয়া তাহার কাছে দিনে শতবার ক্ষমা ভিক্ষা করা। এতে কি নিজেকে ছোট হইতে হয় না! বলিল—

এমন আর না হয় সে ভাল, কিন্তু আপনি কথাগুলো হিসাব ক'রে ব'ললেন? সকলকে আঘাত দিয়েই কি আপনি খুশী হন?

লীলা দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

বগলা ভাবিয়া পায় না,—এ ক্রোধের হেতু কি? এমন বেড়াইতে সে ত হামেসাই বাহির হইয়া থাকে, কেউ কোনদিন ত অসন্তুষ্ট হয় না। এর কোন মানে হয়?

কয়েকদিনে বগলা অনেকটা ভাল হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ একদিন বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বগলার প্রতিজ্ঞা অভ্যাস দোষে আবার ভাঙিল। বগলা বেলা একটা অবধি অকাতরে ঘুমাইতেছিল,—তন্দ্রাস্বপ্নে কত কি দেখিয়া যাইতেছিল। লীলার কঠিন কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিয়া বসিল—

লীলা বলিল,—খাবেন না?

—ওহো হো, তা বড্ড অন্যায় হ'য়ে গেছে। এমন আর হবে না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজকের মত ক্ষমা করুন—

লীলা ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল,—কেন আপনি আমার কাছে এমন ক'রে ক্ষমা চান?

বগলা নির্ব্বোধের মত কিছুক্ষণ লীলার রক্তাধরের দিকে চাহিয়া রহিল। লীলা পুনরায় খাইবার আদেশ দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

আহারান্তে বগলা বর্ম্মা চুরুটের ধোঁয়ার জালে অর্দ্ধনিমীলিত তন্দ্রালস চোখে উপন্যাসের ক্রমবিকাশের পথ খুঁজিতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখে লীলা বলিতেছে—দেখুন, আপনি অত দূরে দূরে থাকতে পাবেন না; ওতে আমার সত্যিই কষ্ট হয়।

বগলা বলিল, দেখুন, এই অভ্যাসগুলো আমার মধ্যে এমন শেকড় পুঁতে ব'সেছে যে পারিনে,—সেজন্য আমি দুঃখিত। আর কোনদিন—

লীলা ক্রোধরক্তিম ওষ্ঠাধর কম্পিত করিয়া কহিল—আপনি—আপনার সঙ্গে কথা ব'লতে চাইনে,—আপনি অত্যন্ত স্বার্থপর।

রমেশ কোথায় বাহির হইয়া যাইতেছিল, বলিল,—কি হে বগলা, দাম্পত্য-প্রেম সুরু ক'রে দিলে নাকি ?

বগলা হাসিয়া বলিল,—রামচন্দ্র! তুমি আমাকে অত ছোট ভেবো না। বন্ধু-পত্নীর শাসন অতি মধুর তারই রসাস্বাদন ক'রছি, ভাগ্যিস্ আমার আর একটা বিয়ের জন্য শাসন সুরু হয়নি!

লীলা ম্লানমুখে উপরে উঠিয়া গেল।

বগলা ভাবিল,—এমন গর্হিত অপকর্ম্ম সে আর কখনও করিবে না। আজ যাহা নেহাৎ অভ্যাস-দোষেই হইয়া গিয়াছে আর এঁদের এত অসুবিধা হইয়াছে, তেমন কাজ আর না হয়! যতই হোক সে আশ্রিত ত বটে!

এমনি মান অভিমানেই তিনটী মাস কাটিয়া গেল—

লীলা দ্বিপ্রহরে দোতলায় পালঙ্কে শুইয়া মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল। দেখে, প্রসিদ্ধ সমালোচক নকড়ি নন্দী 'রেলওয়ে সিরিজ'এর উপর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভাবার্থ এই যে রেলওয়ে সিরিজের মধ্যে তিনি একখানি অমূল্য উপন্যাস আবিষ্কার করিয়াছেন। নাম 'ঢেউ', লেখিকা মঞ্জুলিকা সেন, কিন্তু গ্রন্থের দলিলে বগলারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর। অতএব বোঝা যায়, প্রকাশক অধিক কাটতির আশায় লেখিকার নাম সন্নিবেশ করিয়াছেন ইত্যাদি এবং পরিশেষে এই বগলারঞ্জনের বিষয়ে দেশবাসীকে তৎপর হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

ক্রোধে অভিমানে লীলার অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিল। দ্রুত পায়ে আসিয়া দেখে বগলা লিখিয়া চলিয়াছে,—নাকে মুখে কপালে কালি। কপাল ভরিয়া ঘর্ম্মকণা সঞ্চিত হইয়াছে। রূঢ় স্বরে বলিল—শুনুন—

বগলা চমকিয়া উঠিয়া বলিল—বলুন।

—আপনার লেখা বই বেরিয়েছে, সে কথাটাও কি আমাকে জানাতে নেই ?—কাগজের উন্মুক্ত পত্র বগলার সামনে ফেলিয়া দিল।

স্মলপাইকা অক্ষরগুলি চৈত্র মাসের রৌদ্রের মত বগলার চোখের সম্মুখে ঝিলমিল করিতে লাগিল। বলিল,—এ অন্যায় হ'য়েছে। আমার মনে নেই, তার পরে ধরুন উপরে গিয়ে সংবাদ জানাতে সাহস হয়নি। কি জানি বাড়ীর ভেতরে কে কি অবস্থায় থাকে ! তা আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

লীলা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝিল, যে তাহাদের মিলন-সম্ভোগের সীমাহীন উদ্দাম উদ্দীপনা কখনও কোন ভাবে যেন এতটুকু ব্যাহত না হয়, এরই জন্য এই সঙ্কোচ। লীলা ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—আপনার সঙ্গে কথা বলাই যে দুর্ভোগ,—অত ক্ষমা আমি ক'রতে পারবো না—

অকারণেই লীলার চোখ দু'টি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল।

অবরুদ্ধ অভিমানে লীলা অনেকক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বালিশ ভিজাইয়া দিতে লাগিল,—এত সঙ্কোচের ত কোন প্রয়োজন নাই। সে অমন ভিখারীর মত, আশ্রিতের মত, তাহারই কাছে দিনে শতবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে—এ আঘাত তাহার কাছে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

বগলা ভাবে। এই অদ্ভুত মেয়েটির এই অবান্তর, অহেতুক ক্রোধের কোনও তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পায় না। কি করিলে এই মেয়েটি সন্তুষ্ট

হইতে পারে তার কোনও ফন্দীই মাথায় আসে না। দুপুর রাত্রি অবধি মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়াও কোন কিনারা পায় না,—ঘুমাইয়া পড়ে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় বগলা ফিরিয়া ঘরের মাঝে প্রবেশ করিতেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল—লীলা তাহার অত্যাচার-জর্জ্জরিত বিছানাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছে। বগলা অপরাধীর মত বলিল,—আপনার এসব ক'রবার কি দরকার? এতে বড্ড অন্যায় হয়—এ আমিই ক'রে নেব এখন।

লীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—নিজে ক'রবেন, তাইতো এই ছিরি হ'য়েছে বিছানার। মানুষে দেখলে কি মনে করে?

বগলা জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল,—যা বলে বলুক, কিন্তু আপনি বিছানা ঝাড়লে মানুষে তার চেয়ে অনেক বেশী ব'লবে?

লীলা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—তা ব'লবেই ত!

সে নিঃশব্দে উপরে আসিয়া রমেশের চা করিয়া দিল। চোখ দুইটি পরিষ্কার করিয়া লইয়া রমেশের চা'র মজলিস্ মুখরিত করিয়া তুলিল। প্রাণ খুলিয়া হাসিতে যায় কিন্তু ওষ্ঠের কাছে আসিয়া সে হাসি যেন শুকাইয়া যায়, মনে হয় এমন হাসির কোন সার্থকতা নাই—এ প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র।

বগলার চা নিজে আনিয়া বলে,—এই যে চা!

অন্যমনস্ক বগলা বলে,—চা? ও তা ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হ'ত।

—তা হ'তো জানি। আমি কিন্তু আজ সহসা যাচ্ছি:নে, উপন্যাসের কিছু পড়ে শোনাতেই হবে।

—তা নিয়ে যান বইখানা—

—না, আপনিই পড়ুন, আপনার যা লেখা—

বগলা জানে তাহার লেখা পড়া সত্যই দুরূহ তথাপি বলে, না বেশ

স্পষ্ট ক'রে লিখেছি, পড়তে কষ্ট হবে না। রমেশ হয় ত আপনার জন্তে অপেক্ষা ক'রছে—

লীলা বই হাতে করিয়া উপরে উঠিয়া আসে, কিন্তু পড়া হয় না। ভাবে তাহার সংসর্গ, সাহচর্য্য কি এমনি অসহ্য।

এমনি করিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের হাসি-কান্নায় আরও দুইটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বগলা যেথানে যেমন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ঠিক তেমনি আছে। পরিবর্ত্তনের মাঝে একখানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে—তাহাতে পাইয়াছে একশত টাকা। কিছু জামা কাপড় হইয়াছে, বাকী অর্থ চা রেস্তোরাঁ, থিয়েটার, বায়স্কোপে ব্যয় হইয়াছে। লীলার বুকে সন্দেহ দ্বিধার-স্রোত অবিরত দংশন করিয়া ফিরিত, তাই ভাঙন ধরিয়াছে, আজ সে একতলায়ও নাই, দ্বিতলেই নাই, মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের প্রবল আকর্ষণ নীচু হইতে তাহাকে প্রবলবেগে টানিতে আরম্ভ করিয়াছে।

লীলার একটি ছোট্ট ছেলে হইয়াছে—

বগলার ঘরের সম্মুখে চাকরের কোলে বসিয়া অস্ফুট 'মা' 'বাবা' বুলি বলে, শিশু কচি হাত নাড়িয়া বাগানের লাল ফুলের জন্য কাঁদে। বগলা মাঝে মাঝে কোলে করিয়া কপালে কালির টিপ দেয়।

বগলা মহাসমস্যায় পড়িয়া যায়।

ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি কালির দোয়াত উল্টাইয়া দেয়, কালি ছিটাইয়া একাকার করে। বগলা রাগ করে না, বন্ধুহীন জীবনে একটী সাথী পাইয়া তাহার আনন্দই হয়, হোক সে অত্যাচারী, তবুও সুন্দর ত!

আগে উপরের হাসি-ঠাট্টার কলরব নীচ অবধি ভাসিয়া আসিত, বগলার মন তাহাতে বিমনা হইত না, কিন্তু আজকাল মনটা সংশয়ে ভীত

হইয়া পড়ে—উপর হইতে মাঝে মাঝে কলহের একটু সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

লীলার অত্যাচার বাড়িয়াই চলিয়াছে—

কাছে বসিয়া দুই বেলা না খাওয়াইতে পারিলে তাহার অভিমানের অন্ত থাকে না। হাতপাখা লইয়া বাতাস করে, বারণ করিলে অকারণ কাঁদে। বগলা অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া বাতাস খায়, ভাতের অচর্ব্বিত ডেলাগুলি দ্রুত গলাধঃকরণ করিয়া চলিয়া আসে। বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। ছাতা লইয়া পলায়নের চেষ্টায় বাহির হইতে চায়, পিছন হইতে কর্কশ কণ্ঠে লীলা বলে—কোথায় যাচ্ছেন?

বগলা আমতা আমতা করিয়া বলে—একটু কাজ—

—না কোনও কাজের দরকার নেই এই দুপুর রোদে—

বগলা তবুও সাহস সঞ্চয় করিয়া বলে—না, সত্যিই জরুরি।

লীলা হাত ধরিয়া বলে—তা থাক, এসে শুয়ে পড়ুন। টানিতে টানিতে লইয়া যায়। বগলা শুইয়া চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে, না ঘুমান পর্য্যন্ত লীলা শিয়র ও তালের পাখার কোনটাই ছাড়ে না। বগলা বলে,—আচ্ছা থাক্‌, থাক্‌, সুইস্‌টা খুলে দিন, তাতেই হবে—কষ্ট ক'রবার দরকার কি?

লীলা ধরা গলায় বলে,—ইলেক্‌ট্রিক বিলের টাকা ত আপনাকে দিতে হয় না।

বগলা নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকে লীলা নিঃশব্দে চলিয়া গেলেই লাফ দিয়া উঠিয়া ছাতা বগলে বাহির হয়। টো টো করিয়া ঘুরিয়া রাত্রে ফিরে—

লীলা ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দেয়—বাইরের কাজ একটু কমালে এমন কি ক্ষতি! আমি দু'দিন সেবা ক'রলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না।

আমি রাক্ষসী নই, জ্যান্ত মানুষও গিলতে পারিনে।...বাইরের কাজ যে কেন বেড়েছে তা বুঝি। লীলা কাঁদে, বগলা পরদিন যথাসময়েই ফেরে।

সেদিন মধ্যাহ্নে রমেশের সহিত লীলার মৃদু কলহের সুস্পষ্ট শব্দ ভাসিয়া আসিল। বগলা শিহরিয়া উঠিল। ভাবে—যেদিকে হয় চলিয়া যাইবে। লীলার এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে দম বন্ধ হইয়া আসে। রমেশ কি ভাবে, কে জানে! একটু মুক্ত বায়ুর আস্বাদন করিতে মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠে—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান কি এর চেয়ে আরামদায়ক নয়?

লীলা রক্ত-আঁখির উপর হইতে আঁচল নামাইয়া বগলার দিকে চাহিল। বগলা অপরাধীর মত সবিনয়ে বলিল,—আমি একটু দু'চার দিনের জন্ম বাইরে ঘুরে আস্‌তে চাই—

লীলা বগলার হাত ধরিয়া বলিল,—আপনার মনে কি এতটুকু মমতা নেই, আপনার এত অত্যাচার আর সইতে পারিনে—

লীলার হাতের সোনার চুড়ির ঝিকিমিকি, আর শুভ্র হাতের একটু স্পর্শ, এক সঙ্গে তাহাকে ধরা-পড়া চোরের মত বিহ্বল, বিমূঢ় করিয়া দিল। আসামীর মত কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—আজ্ঞে, এঁ্যা—

লীলার অন্তর প্রকৃতিস্থ ছিল না, বলিল,—আমার সঙ্গে অমন ক'রে কথা কইবেন না, আপনার বড় দিব্যি রইল—

বগলা বলিল,—তবে যাবো?

—যান্।—লীলা দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

বগলা উল্লাসে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল—কয়েক দিনের স্বাধীনতা, হাত-খরচের কিঞ্চিৎ অর্থ, সুস্থ দেহ, আর কি চাই?

বগলা বন্ধু-বান্ধবের মেস ঘুরিয়া ক্লান্ত দেহে সন্ধ্যার সময় রেস্তোরাঁয় চা পান করিতেছিল, এমন সময় বৃষ্টি নামিয়া আসিল। রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত চা খাইয়া দেখিল, বৃষ্টি যেন একটু কমিয়াছে। এক বন্ধুর মেস উদ্দেশ্যে রওনা দিল; কিন্তু কিছুদূর যাইতেই আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল।

রাস্তার পাশেই সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে পতিতার দল। বগলা একজনকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। উপরের ঘরটার মেঝেয় দাঁড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল,—এই যে, কি বিষ্টি দেখছো ত? বাইরে ত থাকা যায় না, একটু শুয়ে থাকতে চাই, দু'টাকা দিতে পারি, বাকী আট আনা কাল খেতে হবে। আর তোমার অন্যত্র শোওয়ার একটু স্থান হবে না? বাঃ এই ত, মাদুর রয়েছে, একটা বালিশ আর চাদর দিলেই হবে! নীচে, এখানে শোব'খন।

মেয়েটি বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। অনেক দিন অনেক অতিথি আসিয়াছে, কিন্তু এমন খাপছাড়া লোক আসে নাই। বলিল,—না থাকুন ওখানেই, আমার জায়গা আছে।

বগলা দুইটি টাকা ফেলিয়া দিয়া নির্ব্বিকার ভাবে শুইয়া বলিল,—ব্যস্ চমৎকার বিছানা! দরজাটার যা হয় ব্যবস্থা ক'রো, আর কাল ন'টার আগে ডেকো না—

মেয়েটি কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া চলিয়া গেল।

সকালে বগলার ঘুম ভাঙিল নয়টায়। চাহিয়া দেখে, বারান্দায় কতকগুলি মেয়ে জটলা করিতেছে। একজনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—দেখুন ঘর দোর, আমি চল্লুম,—দেখুন পকেট, আট গণ্ডা পয়সা ছাড়া কিচ্ছু নেই—

মেয়েটি হাসিয়া বলিল,—না দাঁড়ান, দেখি কি চুরি ক'রেছেন দেখি—

—আসুন।

ঘরের ভিতরে আসিয়া বগলা বলিল,—দেখুন, একটা জিনিষ চুরি ক'রতে ইচ্ছে হ'য়েছিল, কিন্তু বাল্যকাল থেকে সংযম অভ্যাস ক'রেছি কিনা, তাই করি নি।

—কি ?

—ওই শুক্‌নো গোলাপ ফুলটা।

ঠাট্টার ছলে মেয়েটি বলিল,—ঘর থেকে দূর ক'রে দিলেন, আমাদের ফুল নিলে দোষ হবে না ত ?

—একটুও না, আমার মনের প্রতিবাদ আমি করি না, তাই লোকে বলে আমি অদ্ভুত—এটা নিলুম—আচ্ছা আসি।

—দাঁড়ান, আজ আসবেন না ?

—আর ত টাকা নেই।

—টাকা ত নাও লাগতে পারে !

—ব'লেছি ত, যদি জায়গার অভাব হয় তবে আসবো বৈ কি !

বগলা রাস্তায় বাহির হইয়া দেখে আকাশ ঘনমেঘে অবলুপ্ত,—হন্ হন্ করিয়া চলিতে সুরু করিল।

ঘুরিয়া ফিরিয়াই সে দিনটা চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন, অনাহারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৈকালে সাহেবী-দোকানের শো-কেস দেখিতেছিল। শরীরটা অবসন্ন, একটাও পয়সা নাই, বিড়িও নাই, অনিশ্চিত পদক্ষেপে সে রমেশের বাড়ীর দিকেই চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বগলা শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে চোরের মতই নিজের ঘরটায় বসিয়া ছিল। লীলা ধীরে ধীরে আসিয়া বিছানার পাশেই

বসিল। বগলা সবিস্ময়ে দেখিল, লীলার চির-পরিপাটি কুন্তলগুচ্ছ আজ অযত্নে ধূসর, মুখের সে শ্রী নাই, সে লালিমা নাই, সে সৌন্দর্য্যের স্মৃতিটুকু নাই—খরস্রোতা নদী আজ অকস্মাৎ যেন ধূসর তপ্ত বালুচরের বুভুক্ষা লইয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে।

বগলা ঘরের অন্ধকার কোণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল,—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খেতে দেবেন।

লীলা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল—

খাদ্য পানীয় ও হাত-পাখার বাতাসে বগলাকে পরিতুষ্ট করিয়া সে সহসা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। কি যেন একটা বলিতে গিয়া চোখে আঁচল চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বগলা বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল—এ ঘটনাটা কারণহীন কার্য্য, কর্ত্তাহীন ক্রিয়া। এর কোন মানে হয়?

লীলা বগলার দিকে অশ্রু-সজল চোখ দু'টি মেলিয়া ধরিলে বগলা বলিল,—পয়সা একটীও নেই, বিড়ি ফুরিয়ে গেছে—একটা পয়সা দেবেন?

লীলা অপলক দৃষ্টিতে বগলার লজ্জানত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—দুই ফোঁটা অশ্রু উন্নত বুকের উপর আসিয়া পড়িল। সে পুনরায় নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া গেল।

রাত্রি দশটায় অকস্মাৎ লীলা ঝড়ের বেগে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার পায়ের উপর মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—বল আমাকে ক্ষমা ক'রলে?

বগলা ব্যস্তব্যস্ত ভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—ছিঃ আমি কি ক্ষমা ক'রবো, আমি এমন আর ক'রবো না।

কিন্তু কি করিবে না সেইটাই সে সঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না।

লীলা বলিল,—এই কথাটি ব'লবার জন্যই দেরী ক'রছিলাম, নইলে—

লীলা উদ্‌গত-অশ্রু বিহ্বল চোখের উপর আঁচল চাপিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে দারোয়ানের মুখে বগলা খবর পাইল—লীলা গতরাত্রে বিষাক্ত ঔষধ সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

যথা সময়ে সৎকারও হইয়া গেল—

রাত্রি দ্বিপ্রহরে রমেশ বগলাকে ডাকিয়া উপরে লইয়া গেল। বগলা ভাবিয়া পায় না, কি করিয়া বন্ধুর এই বিয়োগ-বেদনার মহাদুর্য্যোগে সে সমবেদনা জানাইবে। রমেশ নীরবেই একখানা চিঠি দিল—

স্বামী,

বিবাহ হইবার পর হইতে আমি কোনদিনই ভুলিতে পারি নাই, তুমি আমার স্বামী! আমার জীবন-যাত্রার আনন্দ উদ্দীপনা কখনও ব্যাহত হয় নাই সত্য, কিন্তু সর্ব্বদা মনে হইয়াছে, আমি যে বাড়ীর উপর-তলায় হাসিতেছি তাহারই নীচে বসিয়া আমার স্বামী ম্লানমুখে লেখনী চালনা করিতেছে। আজ যেখানে চলিয়াছি সেখানে যদি বিচারক থাকে আমার অন্তরের বিচার হবে—তুমি হয়ত তাহা বিশ্বাস করিবে না। আমার অশেষ দোষ ক্রটি তুমি ক্ষমা করিতে পারিবে না জানি,—সেই পাপের শাস্তি যেন আমি মাথা পাতিয়া লইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ করিও…

খোকা রহিল, এই জগতে এই অভাগ্য শিশুর তুমি ছাড়া দ্বিতীয়

কোন পরিচয় নাই, তাহাকে তোমার হাতেই দিয়া যাইতেছি, ওকে শাস্তি দিও না। ও এ জগতে কোনও অপরাধ করে নাই।

আমি বুঝিয়াছিলাম, আমার বাঁচিয়া থাকা চলিবে না, তাই চলিলাম। জগতের কাছে আজ আমার সমস্ত প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। যাইবার সময় শুধু এই দুঃখটাই ভুলিতে পারিতেছি না যে, আমি তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া নিঃসঙ্কোচে কাঁদিতে পারি নাই। আমার প্রণাম গ্রহণ করিও। ইতি

একমাত্র তোমারই

লীলা।

বগলা পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া স্তূপাকার জড়পদার্থের মত বসিয়া রহিল। বাহিরে চাহিয়া দেখে অন্ধকারের মাঝে আলোর লেশমাত্র নাই, শুধু নিবিড় ঘনীভূত অন্ধকার।

ঘুমন্ত শিশু ও একতাড়া চাবি বগলার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া রমেশ বলিল—ভাই, তুই কিছুদিন এখানে থাক্‌, আমি ঘুরে আসি—

তাহার পরদিন রমেশ সত্যই পশ্চিমে চলিয়া গেল।

বগলা দুই দিনে বিব্রত হইয়া উঠিল। এই একতাড়া চাবি আর ক্ষুদ্র শিশুটি যে এত ভারী সে ত তাহা আগে বুঝে নাই। নির্জ্জনে বসিয়া বিপিনকে লিখিল—

বিপিন,

অনেকদিন পর তোমার কাছে পত্র লিখিতেছি,—আমি বিবাহ করিয়াছিলাম, ব্যাপারটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই :—

* * * * *

আমি তাই আজ ভাবি, লীলা যে আত্মহত্যা করিয়াছে তাহার মূলে কোন্‌ প্রবৃত্তি ছিল। আজ আমার স্পষ্ট মনে হইতেছে, মেয়েদের অন্তর

সত্যিই বড় দুর্ব্বল, বড় কোমল। তরল পদার্থের মত যখন যে পাত্রে থাকে তখন ঠিক তেমনি রূপ এবং আকার পরিগ্রহ করে। সেই জন্যই ওরা আত্মবোধ করিতে পারে না, তাই প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়—আজ যদি সমগ্র ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় তাহারা প্রথম হয় তবে আমি এতটুকুও আশ্চর্য্য হইব না। প্রতিযোগিতায় যাহাকে পরাজিত করিতে পারে না, তাহাকেই তাহারা বেশী করিয়া চায়—লীলা সেইজন্যই বোধ হয় আমাকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু এ ভালবাসাকে আমি সমর্থন করিতে পারি না।

পুরুষ যেমন স্বল্পতর ব্যক্তিত্ববতী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, মেয়েরাও তেমনি অধিকতর ব্যক্তিত্ববান পুরুষের স্কন্ধে ভর না দিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। আজ সে যে আত্মহত্যা করিয়াছে সেও ওই একই কারণে। দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই আত্মহত্যা করে। দুর্ব্বল বলিয়াই তাহারা আভিজাত্য সম্মান এবং সংস্কারকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে। সংস্কারের পদমূলে ভালবাসাকে নিবেদন করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্যই পৃথিবীর কাছে তাহাকে বিদায় লইতে হইয়াছে। স্ত্রী-চরিত্রে অসামঞ্জস্য তাই স্বাভাবিক।

আমার জীবনও শেষ হইয়া আসিয়াছে। শীঘ্রই যক্ষ্মা-হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে হইবে। যাহা শিখিয়াছি তাহা এই ক্ষুদ্র জীবনের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। আর একটি কথা, মানুষের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন ভোগ একান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠে, পরে হয়ত তাহার প্রয়োজন থাকে না। আমাদের যে দুঃখ, তাহার মাঝে আছে অতৃপ্ত তৃষ্ণা, আর না পাওয়ার দুঃখ, একে অধ্যাত্ম্য প্রেমের চৌহদ্দি দিয়া আমরা যতই কেননা মূল্য দি, এ নিছক তৃষ্ণাই। যদি তৃষ্ণা না থাকে, তবে ভালবাসার অস্তিত্ব কোথায়? মানসিক শক্তির পর্য্যায় অনুসারে ভোগ ভিন্নরূপ লইয়া দেখা দেয় এইমাত্র। ইতি

সহসা একদিন রমেশ ফিরিয়া আসিল। বগলা চাবি ও শিশুর বোঝা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—এ এত ভারী যে আমি বইতে পারিনে। কাল ব্যারাকে ফিরে যাবো—

পরদিন বগলা সত্যিই তাহার রুগ্ন দেহের গুরুভার লইয়া ব্যারাকের অপ্রশস্ত ঘরে জীর্ণ শয্যা বিছাইয়া লইল।

দীর্ঘ ছয়টি বৎসর চলিয়া গিয়াছে—

ফুলশয্যার রাত্রেই বিনোদের শিল্পী-জীবনের উপর যবনিকা পাত হইয়াছে, তাহার অন্তরালে যাহা ঘটিতেছে, তাহা মেয়েলী উপন্যাসের দৈনন্দিন সহিষ্ণুতার দীর্ঘ ক্লান্তিকর কাহিনী—আদি-অন্তহীন প্রলাপ মাত্র। বগলার জীবনও ব্যারাকের ছিন্নমাদুরের অন্তরালে প্রায় অদৃশ্য—বাকী যেটুকু তাহা স্পষ্ট ভাবিয়া লওয়া যায়। কবি বিপিনের জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—সামান্য একটু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে এবং বেহালার বাকী তাঁতটিও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রয়োজনাভাবে বিপিন তাহা আর লাগায় নাই।

মাহিহার রাজ্যের একটা উপত্যকা ভূমি—তাহারই একপ্রান্তে বিপিনের তাঁবু। পিছনে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাদেরই লাক্ষের বাগানের শীর্ষে শীর্ষে রক্তিম সূর্য্যরশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আর একটু পরেই তাহার চারিপাশে নিবিড় অন্ধকার নামিয়া আসিবে—

বিপিন ভাবিতেছিল—এই মাঠে তাহার জীবনের কতদিনই না গিয়াছে! শীতে মাঠ ধূসর হইয়া যায়, কালবৈশাখীর শৃঙ্খলহীন নৃত্যে লাল

তমাল গাছের মাথা দোলে, শ্রাবণ ধারার স্পর্শে ওই মাঠটি সলজ্জ নবোঢ়া বধূটির মতই ত্বরিত শ্যামল অঞ্চল সারা গায়ে ছড়াইয়া দেয়। প্রবল বর্ষণে সব ঝাপ্সা হইয়া আসে, কতদিন সন্ধ্যা এমনি কালো ডানা মেলিয়া নামিয়া আসে, কোনদিন জ্যোৎস্নার মাদকতায় বনশ্রেণী তন্দ্রালস হইয়া যায়। নিত্য ওই একই শ্রী অমিল অঙ্কের মত এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া যায়।

এই নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জন বনশ্রেণীর মাঝেই বিপিন ছয়টি বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে। কবি-প্রাণ বেশী ক্লান্তি বোধ করে নাই। নিত্য একই কাজ করে, একই কথা ভাবে, একই আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সঙ্গে জীবন-স্বপ্নের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে। বাঙালী কোম্পানীর চাকুরী, উন্নতিও নাই অবনতিও নাই। জগতের উপর গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ আসে আবার যায়। বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ আসে, দিনের পর রাত্রি আসে—

বিপিন একাকী বসিয়া নীরব অবসরে নিত্য একই কথা ভাবে,—তাহার অন্তরের একান্ত জীবনস্বপ্ন—

একটি ছোট পল্লীর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটি বাংলো ধরণের নিখুঁত বাড়ী—যাহার কল্পনা সে অনেকদিন অনেক ভাবে করিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। দক্ষিণের গেটের কাছে দুইটি বৃহৎ ইউক্যালিপ্টাসের গাছ, একটি ছোট সুরকীর রাস্তা, ছোট ফুলের বাগান, তাহার সংলগ্ন একটি দালানে তাহারই প্রাঙ্গণে নিত্য দুইখানি আলতাপরা চরণ ত্রস্তভাবে ছুটিয়া বেড়াইবে। তাহার আবির্ভাবে স্তব্ধ হইয়া ক্ষণিক দাঁড়াইবে—ভ্রূ-ভঙ্গিমার সে এক অপূর্ব্ব মাদকতা, রহস্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠে। প্রণয়-ভীরু বালিকাবধূ, পাষাণ কারা ভাঙিয়া মন নদীতীরের বকুলতলায় লুটাইতে চায়।...তাহার পরে প্রণয়-অপরাধে সেই সজল চোখের অভিমান, নিত্য শত ব্যাকুল প্রশ্ন। সেই তাহার জীবনের চারিপাশ ঘিরিয়া অবসাদ মুছাইয়া দিবে।...নিশীথ রাত্রে তাহারই আম্রবাগানের মাথার উপর চাঁদ

উঠিবে। সেই জ্যোৎস্নালোকে ঘুমন্ত শ্রীখানি লুব্ধ দৃষ্টিতে পান করিয়া লইবে।...একটি অবাধ্য দুরন্ত শিশু, কাহারও কথা শোনে না, হিংস্র কুকুরের পিঠের উপর নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া মোয়া খায়,—মাতার দুর্ব্বল মন শঙ্কায় ভরিয়া উঠে। বাড়ীর সাম্‌নে থাকিবে একটি ময়না, নিত্য ভোরে জাগাইয়া দিবে।

বিপিন হিসাব করিয়া দেখে ব্যাঙ্কে জমিয়াছে আঠার শত টাকা, এখনও তিন হাজারের অনেক বাকী। ভৃত্য লালু জানায় রুটি প্রস্তুত। বিপিন নড়িয়া চড়িয়া বসে।

মাঝে মাঝে কুলিদের গ্রামে যায়। দেখে—ইন্দারার পাড়ে পল্লীবধূরা জল তোলে। বিপিন লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। ক্ষীণ দুইখানি বাহু জলের বালতি টানিয়া টানিয়া তুলে, শিশু মাতার জানু জড়াইয়া ধরে, বিপিন মুগ্ধ, অতৃপ্ত নয়নে দেখে—

স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি অবধি বসিয়া থাকে। কোন দিন চাঁদ আর মেঘে বালিকা বধূর মত লুকোচুরি খেলে, কোনদিন ঝড় বৃষ্টি পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে—

বিপিনের সমস্ত চৈতন্য স্বপ্নের নেশায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সমস্ত অন্তর দিয়া স্বপ্নকে বাস্তবের মত ভোগ করিয়া লইতে চায়।

বিপিন সামান্য একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে—মেয়েরা যখন ভালবাসে তখন যেমন সমস্ত প্রাণ উন্মাদ হইয়া উঠে তেমনি একদিন সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষে মুছিয়া যায়। ঝড় বৃষ্টির মত উন্মাদনা আছে, ক্রিয়া আছে, কিন্তু স্থায়ীত্ব নাই। মানসিক ও শারীরিক বিধানে তাই তাহাদের পক্ষে স্নেহকে পণ্য করা সম্ভব এবং স্বাভাবিক, পুরুষের পক্ষে তাহা একান্তই অসম্ভব।

এখানে আসিয়া বিপিনের সঙ্গে এই দেশী একটি তরুণীর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাহার নাম মহুয়া, শক্তিশালী একটি যৌবনোজ্জ্বল দেহ। তাহাদের যৌথ-জীবনের একটি রাত্রির অনাড়ম্বর গাথা—

হেড আফিসের বাবু টাকা পাঠান নাই। কুলিরা যথা সময়ে টাকা পায় নাই বলিয়া তাহারা সাহেব অর্থাৎ বিপিনকে মারিবে ঠিক করিয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া মহুয়া রাত্রিতে গোপনে দেখা করিতে আসিয়াছিল।

মহুয়া বলিল,—সাহেব, ষ্টেশনে টাকা পাওয়া যাবে না?

—যেতে পারে।

—তবে চল, ভয় নেই, তুমি তোমার বন্দুক নাও, আমি তীর ধনুক নিয়ে যাচ্ছি।

—না দরকার নেই।

এই আসন্ন বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইতে বিপিনের প্রবৃত্তি ছিল না। তাই বলিয়াছিলাম,—মহুয়া, জগতের এত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য। মরে যাওয়াটা এত স্বাভাবিক যে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানর ইচ্ছে বা সাহস আমার নেই।

কিন্তু মহুয়ার কাতর মিনতির বিরুদ্ধে বিপিনের এ ভীরুতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। অবশেষে বিপিন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্তের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিবার মধ্যে পৌরুষ নাই মনে করিয়া সে মহুয়াকে কোন ক্রমেই সঙ্গে নেয় নাই।

আসা যাওয়ায় প্রায় চারি ক্রোশ পথ—শ্বাপদসঙ্কুল বনের মাঝ দিয়া। বিপিন বন্দুকের টোটা পরীক্ষা করিয়া, অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিল। পাহাড়ের উপর বাঘের ডাক, দুই একটা বন্য জন্তু এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বিপিন চলিতে চলিতে ভাবিয়াছিল—বন্দুকটা একটা অকারণ বোঝা, রাখিয়া আসিলেই ভাল হইত।

ষ্টেশনে আসিয়া বাঙালী ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে টাকা মিলিল বটে, কিন্তু ফিরিবার পথে সহসা আকাশভরা তারা ঘন মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। পথের শুভ্র একটু রেখা দেখা যাইতেছিল, এখন তাহাও দেখা যায় না, ঝড় আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশ, বাতাস, বনশ্রেণী ঘন অন্ধকারের সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। বৃষ্টিও নামিল,—পাহাড়ী বৃষ্টি স্থচের মত বেঁধে—এমনি শীতল।

অন্ধকারে চলিতে চলিতে একটা পাথরে বাধিয়া বিপিন রাস্তার নয়নজুলিতে পড়িয়া গেল। কোনমতে উঠিয়া বসিতেই শোনে, একটা জানোয়ার সমস্ত বন ভাঙিয়া তাহারই দিকে আসিতেছে। বিপিন হাতড়াইয়া বন্দুকটা কাঁধের উপর তুলিয়া ধরিল।

—সাহেব, গুলি ক'রো না।

মহুয়া—এই অন্ধকারে তাহার অলক্ষ্যেই আসিয়াছে। মহুয়া তাহার হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া শুধাইল,—লাগেনি ত?

—হাঁা, লেগেছে বই কি—হাঁটুর ওখানে বোধ হয় মাংস ছড়ে গেছে—

—এস, তোমরা বিদেশী লোক সব ত জানো না।

ক্রোধোন্মত্ত ভৈরবের মত বৃষ্টি আর ঝড় পৃথিবীর উপরে নামিয়া আসিল, চারিপাশের গাছের পাতায় ঝড়ের স্বন্ স্বন্ শব্দ অসিযুদ্ধের ঝন্ঝনার মত বাজিতে লাগিল। মহুয়া বলিল, আমার হাত ধরে ছুটে এস—তুমি চিন্‌বে না।

বিপিনও বুঝিয়াছিল, এই ঝড় বৃষ্টিতে সংজ্ঞা থাকিতে থাকিতে তাঁবুতে পৌঁছাইতে না পারিলে মৃত্যু মৃত্যুর মতই নিশ্চিত—সেও ছুটিতে লাগিল। কিন্তু বিপিন মনে মনে সেদিন হাসিয়াছিল,—নারীর হাতের দুর্ব্বল একটু স্পর্শকে মাত্র অবলম্বন করিয়া সে আজ জীবনকে বাঁচাইয়া লইয়া যাইতেছিল কিন্তু যে কারণেই হোক্ বিপিন আপত্তি করে নাই।

হঠাৎ একটা পাথরে পা বাধিয়া সে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পরে আর তাহার মনে পড়ে না, সেই দুর্য্যোগের রাত্রিটা তাহার মাথার উপর দিয়া কি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল তখন দেখে সিক্ত বস্ত্রে মহুয়া তাহার তাঁবুতে, তাহারই শিয়রে উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে আর সে নিজের খাটিয়ায় শুইয়া।

বিপিন আজও নিঝুম নিরালায় বসিয়া সেই কথা ভাবে। মনটা মাঝে মাঝে কেমন একটা অপূর্ণতা, অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। মানুষের জীবনে কত লোক আসে যায়, কিন্তু চিরন্তন হইয়া থাকে শুধু একটু স্মৃতি—এই স্মৃতিটাই মানুষের চেয়ে বেশী আপনার। আমাদের জীবনও এমনি একটা স্মৃতির সমুদ্র, কখনও উন্মাদ তরঙ্গ ব্যাকুলভাবে হৃদয়ের তীরে আঘাত করিয়া ভাঙিয়া পড়ে; কখনও আনন্দের আবিলতায় থম্ থম্ করে। আজ যাহা বাস্তব, প্রত্যক্ষ সত্য; কাল তাহাই স্মৃতি। আজ-টা বাঁচিয়া থাকে না, কিন্তু তাহার মোহটা চিরন্তন হইয়া থাকে। আজ মহুয়া হয় ত কোন পাহাড়ীর ক্ষুদ্র একখানা কুটীরে বসিয়া গৃহস্থালীর তুচ্ছ জিনিষ পত্র সাজাইয়া ব্যাকুল আগ্রহে স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। হয় ত বাঁচিয়া আছে, নয় ত নাই,—হয় ত মনে পড়ে, নয় ত মনে পড়িবার মত বিস্তৃত অবসর নাই। বিপিনের অন্তরটা আজ তোগলকের পরিত্যক্ত রাজধানী দিল্লীর মত হাহাকার করে।

বিপিন মাঝে মাঝে শিকারে যায়—সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ছোলার ক্ষেতে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় ফেরে। কোনদিন বন্দুক তুলিয়া শিকারের দিকে চাহিয়া ভাবে, এই ত—ঘোড়াটি টানিলেই জীবটি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করিবে, কোন দিন ভাবে মৃত্যু যেমন করিয়াই হোক একদিন ত আসিবেই। কোন দিন বন্দুক রাখিয়াই বেড়াইতে যায়, বাঘের গর্জ্জন শুনিলে ভাবে—যাহা নিজে বাঁচিতে পারে না, তাহাকে ঠেকনো দিয়া

কতদিন বাঁচানো যায়। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের নৈরাশ্যের দৈন্য, আর জীবন-স্বপ্নের ঘাত-প্রতিঘাতেই বিপিনের জীবনের এই ক্লান্তিকর ছয়টি বৎসর পূর্ণ।

অন্যান্য দিনের মত সন্ধ্যা সেদিনও পৃথিবীর বুকে ঘন বেদনার মত নামিয়া আসিয়াছিল। বিপিন বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—কত সঞ্চিত হইয়াছে। জীবনের সুখ-স্বপ্ন-বালিকা বধূ…পোষা ময়না পাখী…দুরন্ত শিশু।…না এমন করিয়া আর দীর্ঘদিন অপেক্ষায় বসিয়া থাকা যায় না। চাকরকে ডাকিল—লালু—বিপিনের ব্যস্ততার অবধি নাই।

লালু আসিয়া দাঁড়াইল।

বিপিন বলিল—রোজ বাজার খরচ কত হয়?

—আট আনা।

—কাল থেকে ছ' আনার বেশী পাবে না, তাতে যা হয় তাই।

—তা হ'লে ভাল হয় না।

—না হোক,—হিসাব ক'রে দেখেছি, দশ বছরের জায়গায় ন'বছরে হবে লালু,—একটী বছর বড় কম নয়।

লালু চলিয়া গেল। বিপিন আবার ভাবিতে লাগিল—দেহের একটু কষ্ট হইবে, তা হোক। কতদিন ত সে না খাইয়াও কাটাইয়াছে। জীবনের একটা বৎসর—তাতে একশত আশীদিন চাঁদের আলোক, অন্যূন পঞ্চাশ দিন বাদলের নৃত্য, একটা বর্ষা, একটা বসন্ত, একটা শরৎ—তাতে কত কাব্য, কত প্রীতি, কত বিরহ, কত অভিমান, কত অভিসার! চারিদিকে যখন বাদল বন্যার মত ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাহারই গৃহের কার্ণিশ বাহিয়া জলবিন্দু পড়িবে। প্রণয়-ভীরু কিশোরী ভয়ে অবশ হইয়া তাহারই বুকে আশ্রয়

লইবে !···সে বাদলে যক্ষের বিরহ নাই·· কতদিন আমবাগানের মাথায় চাঁদ উঠিবে।. নারিকেলের শীর্ণ ভিজা পাতা জ্যোৎস্নায় ঝিক্‌মিক্ করিবে।

ভাবিতে ভাবিতে বিপিনের মন নেশায় ঝিম ঝিম করে,—কাপড় কিনিবার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসে। যে-দিন স্বপ্নের ঘোরে রঙীন হইয়া আছে, তাহারই সার্থকতার পানে চাহিয়া নিজের উপর নির্দ্দয় লাঞ্ছনা করিয়া চলে।

বিপিনের জীবন-স্বপ্নের শ্রোতাও জুটিয়াছে একটি—সে লালু—

সন্ধ্যায় লালু ও বিপিন বসিয়া গল্প করে, সেই একই গল্প। লালু যাইতে রাজি আছে, তবুও বিপিন বলে,—যাবি ত লালু আমার দেশের সেই বাড়ীতে—

—হ্যাঁ—কতদিন আর আছে ?

—তিন বছর সাত মাস।

—এখনও অনেক দেরী তা হ'লে ?

—বলিস্ কি, তিন বছর কিছুই না, পাড়ি ত প্রায় জমেছে। ছ'বছর ত কেটে গেছে।

বিপিনের আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া লালু তিনটি বৎসরের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে না। সে বসিয়া বসিয়া কেবল শুনে, মাঝে মাঝে বলে—আমি এখান থেকে ময়না নিয়ে যাবো।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রোজ ভোরে ডেকে দেবে।

বিপিনের অন্তর আলোচনার উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠে—আর কিছু ভাবিতে চাহে না।

আজ কয়েকদিন বিপিনের জ্বর, জ্বর যেমন বেশী যন্ত্রণাও তেমনি। জ্বর-গায়েই সে প্রয়োজনীয় কাজ সারে। রাত্রে জ্বর ছাড়িয়া যায়—খোলা

জানালা দিয়া বিস্তৃত আকাশ তাহার কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সে জ্বরের ঘোরে বাক্স খুলিয়া ব্যাঙ্কের হিসাব দেখে, ভাবিয়া যায়—ময়না পাখী, বালিকা বধূ।......

কাল সমস্ত রাত্রিই জ্বর ছিল—মোটেই ঘুম হয় নাই ; সমস্তরাত্রি স্বপ্নের ভীড়ে বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহার সেই বাড়ী। কল্পনা বাস্তব হইয়া নিমেষের জন্যে তাহার নিকট ধরা দিয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া ক্লান্তিবশতঃ শুইয়াই ছিল। লালু আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিল। বিপিন বলিল,—লালু আয়নাটা দে ত।

লালু আয়না দিয়া গেল। বিপিন নিজের প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া দেখে, মাথার চুল, দাড়ির কতক কতক পাকিয়া গিয়াছে। সহসা বিশ্বাস হইল না, আবার দেখিল, কিন্তু নিছক সত্য—পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই জীবনের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গিয়াছে!

বিপিন নিরাশায় অবশ হইয়া গেল। এই ছয়টা বৎসর, এমন করিয়া একটা নির্ব্বাসিতের মত দুঃখে, দৈন্যে, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান, এ কেবলই পণ্ডশ্রম! এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া সে নিজেকে নির্দ্দয়-লাঞ্ছনা করিয়া আসিয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই, কোন পুরস্কার নাই—জীবনের মধ্যে কেবল দুঃখ দৈন্যই সত্য হইয়া আছে! যে স্বপ্নের মোহ তাহাকে এত শক্তি দিয়াছে, এত উন্মাদনা দিয়াছে তাহা এত বড় মিথ্যা! রুদ্ধ ক্রুদ্ধ ক্রন্দন পঞ্জর ভাঙিয়া ফেলিতে চায়—বিপিনের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। বন্যার মত অশ্রুধারা গড়াইয়া বালিশ ভিজাইয়া দিল—সে মুছিল না। ঝাপ্সা দৃষ্টির মাঝে ভাসিয়া উঠিল, সেই সংকীর্ণ বাড়ীখানি, যে ভিটায় সে একদিন বড় হইয়াছিল স্ফুটন্ত কৈশোরে জীবন-স্বপ্ন আঁকিয়াছিল—সেখানে সেই ভিটায়ই আজ জন্মিয়াছে বড় বড় ভেরাণ্ডার গাছ,—লোকে হয়ত এখনও বলে—বিপিনের মা'র ভিটে।

যে স্বপন-বধূ তাহার এই ছয়টি ক্লান্তিকর বৎসরকে স্বপ্নের নেশায় উন্মাদ করিয়া রাখিয়াছিল, সে-ই আজ তাহাকে প্রকাশ্যে হাসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া গেল। জীবনের এই চরম ব্যর্থতা হাতে হাতে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় বিপিন উন্মাদ হইয়া গেল। হাঁকিল—লালু, রূপেয়া লাও, আবি সরাব লে আও।

তিনটি দিন এবং রাত্রি জ্বর ও মদ্যপানের বিস্মৃতির ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। কিছুই মনে পড়ে না,—নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানতা, আর জ্বরের যন্ত্রণা, মাঝে মাঝে একটী গুরু বেদনা বুকের মাঝে কাল সর্পের মত দংশন করিয়া ফিরিতেছে।

যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন নিশীথ রাত্রি। চারিদিকে নীরব জ্যোৎস্নালোকে, বায়ুমণ্ডল স্তব্ধ, নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—দূরের ঘন-বনশ্রেণী তন্দ্রালস। আকাশের বুকে পেঁজা তুলার মত মেঘ—পুঞ্জীভূত বেদনার মত অলস, অবশ, মাতালের মত ঝিমাইতেছে। বিপিনের সারা দেহে ক্লান্তি, জ্বর আর নাই, তবে তাহার দুর্ব্বলতা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস বাঁধিয়া রহিয়াছে। বিপিন উঠিয়া বসিয়া আলোটী সতেজ করিয়া দেখে, টেবিলের উপরে বোতল প্রায় নিঃশেষিত, সামান্য একটু তখনও রহিয়াছে।

যে স্বপ্ন একান্ত নিবিড় ভাবে বুকের শিরা আঁকড়াইয়া দেহের উপর নির্দ্দয় অত্যাচার করিয়াছিল তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে—সে নিজে কোন্ অবলম্বন ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবে! যে অর্থ সে নিজের রক্ত এবং আয়ু বিক্রয় করিয়া সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা সে কোন মতেই মদ খাইয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। মদ্য বিস্মৃতি দেয় কিন্তু···বিপিন কেবল ভাবিতেছিল।

আর এইটুকু মদ, ইহার মাঝেও তাহার নির্ব্বাসিত দিনের সঞ্চিত অর্থ রহিয়াছে, ইহা ফেলিয়া দেওয়া যায় না—বিপিন সমস্তটুকু. ঢক্ ঢক্ করিয়া

পান করিয়া ফেলিল। শূন্যোদরে একটা অসহ্য কামড় দিয়া উত্তেজক তাহার ক্রিয়া সুরু করিল—বিপিনও উষ্ণ মস্তিষ্কে বাহির হইয়া পড়িল।

একটি নদী তাহাদের আফিসের অনতিদূর দিয়া বহিয়া যাইত। এরই তীরে বিপিন অনেক নির্জ্জন সন্ধ্যা কাটাইয়া দিয়াছে। বিপিন নদীতীর দিয়া হাঁটিতে লাগিল—ক্লান্ত দেহে যেন একটু শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে।

অদূরে একটি শ্মশান ঘাট। শবদাহ বৎসরে দুই একটি হয়—যেখানে এই গভীর রাত্রে চিতায় আগুন জ্বলিতেছিল। বিপিন ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখে শ্মশান-বন্ধুরা সকলেই পরিচিত, জিজ্ঞাসা করিল,—কে?

—বাউরিয়া।

একজন উড়িয়া চাকর। কালও সে সজীব ছিল, আজ আর নাই, একটু পরে ছাই হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে। বিপিন ভাবিল—আমিও একদিন ছাই হইয়া যাইব, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা চির-জীবনের অনুভূতি সমস্ত ছাই হইবে। এরাই লইয়া আসিয়া, এমনি করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিবে।

বিপিন পথে চলিতে চলিতে আজ যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মদে যে বিস্মৃতি আনে তাহা ক্ষণিক, মৃত্যু আনিবে অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন বিস্মৃতি —যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তের ঘাত-প্রতিঘাত বুকের প্রাচীরে আছাড় খাইয়া পড়ে না। কিন্তু এখানে এমন করিয়া এই কদর্য্য লোকগুলির মাঝে তাহার জীবন শেষ হইয়া যাইবে—কেহ একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে না,— একটি অর্থহীন, অনাড়ম্বর, ব্যর্থ জীবন!—এই চিন্তাটাই তাহার মনে বিদ্রোহ আনিয়াছিল।

সেই জন্ম-পল্লীর সুস্নিগ্ধ-ছায়া শীতল! তাহারই ধূলা, মাটি মাখিয়া একদিন এই দেহ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। আজ হয় ত কেহ চিনিবে,

কেহ চিনিবে না। তবুও এ দেহ সেই খেজুরতলার শ্মশানেই পৌছাইয়া দিতে হইবে। বিপিন ভাবিল,—আমি বাড়ী যাইব। সেই কেতকী মঞ্জরীর গন্ধে-ভরা পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিব। যাহারা ছোট, চিনিবে না, তাহাদিগকে বলিব, এই যে বিপিনের মা'র ভিটে; যাহার উপর বড় বড় ভেরাণ্ডার গাছ হইয়াছে, সেই আমার বাড়ী। এই যে হাজরা গাছ এর নীচে তোমাদের মত আমরাও বন-ভোজন করিয়াছি।······ঘাটের পথে বাঁশের ঝাড়ে ঘুঘু ডাকিত, নারিকেল গাছে ছিল শঙ্খচিলের বাসা, দুইটি ভার-শালিক ঘাটের কামিনী ফুলের শাঁখে দোল দিত।—সেই খানেই আমার দেহকে মিশাইয়া দিতে হইবে, সেখানকার প্রত্যেক ঘাসের পাতায় অতীতের স্মৃতি আজও শিশির বিন্দুর মত টলমল করিতেছে।

······এখানে এমনি করিয়া মরিয়া যাওয়া—দূরে, প্রবাসে একাকী অসহায় অবস্থায়! এমন মৃত্যুর কোন মানে হয়?

একটা মুদ্রাদোষ, একটু মুখ টিপিয়া হাসি, একটা সাধারণ কথা মানুষের মনের স্মৃতিকে যে কোথায় টানিয়া লইয়া গিয়া, কত অতীতের সঙ্গে মিশাইয়া দেয় তাহা ভাবিয়াও পাওয়া যায় না। বিপিনের মনেও আজ অকস্মাৎ নূতন কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল—বগলা।

সে আজও হয় ত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় কুকুরের মত লোলুপ দৃষ্টি লইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে প্লুরিসি হইয়াছিল, এখনও হয় ত বাঁচিয়া আছে। অর্থ পাইলে এখনও হয় ত বাঁচান যায়, হয় ত তাহার শেষজীবনটা একটু সুখকর করিয়া তোলা যায়।···বিপিন ভাবিল,—অর্থ ত আমার আছে। সে অর্থে আর কি হইবে।

বিপিন দ্রুতপদে নদীতীর দিয়া ফিরিতে লাগিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছিল, ফিরিতে ভোর হইয়া গেল। বিপিন লালুকে বলিল,—লালু, বারোটার গাড়ীতে আমি ক'লকাতা যাবো। আমার সব গুছিয়ে দাও।

বিপিন সেই দিনই বারোটার ট্রেণে কলিকাতায় রওনা হইল।

জনারণ্য হওড়া ষ্টেশনে নামিয়া বিপিন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। এই বিস্তীর্ণ কলিকাতার সহরে বগলাকে কোথায় পাওয়া যায়? জগতের নিষ্ঠুর সংঘাতে সে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে,তাহা কে জানে? বিপিন উপায় চিন্তা করিতে লাগিল,—পরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিবার মত নির্লজ্জতা যখন তাহার নাই তখন যে নিশ্চয় সার্টিফিকেট জোগাড় করিতে পারে নাই, তোষামোদ করিবার মত নীচতা যখন নাই তখন চাকুরীও জোগাড় করিতে পারে নাই এবং যখন আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে তখন চাকুরী পাইলেও থাকে নাই এবং যখন আত্মাভিমান আছে তখন নিশ্চয়ই ব্যারাকে পড়িয়া ধুঁকিতেছে; আর না হয় যক্ষ্মা-হাসপাতালে ভর্তি লইয়াছে। যদি বাঁচিয়া থাকে তবে এই দুইটি স্থানের একটিতে ন. একটিতে তাহাকে পাওয়া যাইবেই। বিপিন হৃষ্টমনে গাড়ী ভাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে ব্যারাকের নিকটে গাড়ী থামিল। বিপিন নির্দ্দিষ্ট ঘরে যাইয়া দেখে তাহাতে নূতন অতিথি একজন আসিয়াছেন—বগলা নাই। সামনের ঘরে ছিলেন স্কুলমাষ্টার ভাগীরথীবাবু, তিনি স্কুলে গিয়াছেন। পাশের ঘরের সেই ভদ্রলোক—যিনি তৈলাক্ত ইলিশ মাছের উৎকৃষ্ট ঝোল রাঁধিতেন, তিনি আছেন। বিপিন বলিল,—এই যে, চিনতে পারেন?

—এঁ্যা, বিপিনবাবু যে।—ষ্টোভের উপর ঝোল হইতেছিল, ঘুঁটিয়া দিয়া বলিল,—বসুন।

—বগলার খোঁজ কিছু জানেন?

—হ্যাঁ বিপিনবাবু, তার বড় ভারী অসুখ ক'রেছিল, জর আর—

ভদ্রলোক চুপি চুপি বলিলন,—কাশির সঙ্গে রক্ত উঠ্‌তো, কিন্তু বলুন দেখি, এটা তার আর অন্যায়, অমন অসুখ নিয়ে থাকা, আমাদেরও ভালমন্দ কিছু হ'তে পারতো, হাসপাতালে গেলেই ত পারতেন।

বিপিন ব্যাকুল ভাবে বলিল,—কিন্তু তারপর ?

—তারপর আর কি ? আমরা সব লিখে দিলাম ব্যারাকের সাহেবের কাছে। হাসপাতালের গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেল। যাবার সময় তিনি হেসে বলে গেলেন, নমস্কার, বড্ড উপকার ক'রেছেন আপনারা।

বিপিন বলিল,—আমার এই সুটকেশ দু'টো রইলো, ওবেলা এসে নিয়ে যাব 'খন।

—আচ্ছা তা থাক্।

বিপিন দ্রুতপদে নামিতে নামিতে ভাবিল,—এই লোকটি সারাজীবন এমনি করিয়া রাঁধিয়া খাইয়া, এই ঘরটির মাঝে বাঁচিয়া আছে, কোনমতে মৃতের মতই অথচ নিজের উপর এত স্নেহ, মৃত্যুকে এত ভয়—এদের জীবনে এরা কি আকর্ষণ পাইয়াছে ? সংসারে তাহা হইলে তাহারাই ত দুঃখী, যাহাদের বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে, বুদ্ধি আছে কিন্তু উপায় নাই—যাহাদের কলেজের মাহিনা দিতে বই কেনা হয় না!

বিপিন খোঁজ লইয়া জানিল, কলিকাতায় যক্ষ্মা-হাসপাতাল নাই—যাদবপুরে একটি আছে। বিপিন তৎক্ষণাৎ যাদবপুর রওনা হইল। একটা শঙ্কা, দ্বিধা যেন মনের উপর পাথর চাপাইয়া দিয়াছিল,—বগলা বাঁচিয়া আছে, না নাই ?

যক্ষ্মা-হাসপাতালের ছোট একটি অফিসে কয়েকজন ডাক্তার এবং কেরাণী বসিয়া ছিলেন। বিপিন জিজ্ঞাসা করিল,—এখানে বগলা মুখোপাধ্যায় ব'লে কোন রোগী আছে ?

—কেন, আপনি কে ?

বগলা হাসিয়া বলিল,—তা হয় ভাল, তবে, কি জানো, যারা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তাদের পক্ষে এই রক্তবমন অনিবার্য্য, উপরের ও নীচের দুই যাঁতার চাপে তাদের রক্ত এম নি ক'রেই বেরিয়ে আসবে, তারা দেশের জন্য, শিল্প সাহিত্যের জন্য প্রাণ দেবে কিন্তু তার এতটুকু ভোগ ক'রবার স্বাধীনতা তাদের নেই—

বিপিন ব্যস্ততার সঙ্গে বলিল,—কিন্তু আটকাতে ত হবে—

বগলা কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল,—এত টাকা তুই পেলি কোথা?

—চাকরী ক'রে—বনে বনে ঘুরে। তুই এখানে এলি কি করে?

বগলা বালিশটা ঠেসান দিয়া বলিল,—শুনবি? তুই চ'লে যাবার পরে বিয়ে করেছিলাম তা ত লিখেছি, তারপর একদিন সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ব্যারাকে উপস্থিত হ'লাম। চারটা বছর আবার ঠিক তেমনি ভাবেই চ'ললো, তবে ক্রমেই যে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছি, তা বেশ বুঝতে পারতাম। একদিন জ্বর হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে কাশি। দেখি, তার সঙ্গে রক্ত—বুঝলাম আর ছ'মাস। এই হাসপাতালে একটা চিঠি লিখে দিলাম কিন্তু এঁরা কিছুই ব্যবস্থা ক'রলেন না। তারপর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কর্ত্তারা এ্যাম্বুলেন্সে ক'রে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন—আমার স্থান ত সাধারণ হাসপাতালে নেই, তারা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'আপনার কে আছে?' ব'ললুম, কেউ নেই। এখানে ফোন ক'রে জানা গেল সিটের অভাব। ডাক্তার ব'ললেন—কি করা যায়? আমি ব'ললুম,—এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে স্থান যদি একটু না-ই মেলে, তবে রাস্তায় বেশ একটা গাছের ছায়ায় রেখে আসুন। ডাক্তারবাবু একেবারে জব্দ, বুঝলাম, মানুষ এখনও সত্যিকার সভ্য হয়নি—কারণ, মনে এখনও অনুভূতি আছে। তারা এখানে পাঠিয়ে দিলেন—দিব্যি আছি। কয়েক দিন মনে হ'চ্ছিল তুই আসবি—

বিপিন বলিল,—বেশ, এখন চল্‌ তা হ'লে একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌বো—

বগলা উৎসাহের সঙ্গে বলিল—চল্‌ যাই।

অদূরে একটী প্রৌঢ়া নার্স বসিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন—কোথায় যাবেন?

—কেন, এর সঙ্গে—

—সে কি, এখন আপনাকে কি নেওয়া যায়? পরিশ্রম একেবারে নিষেধ—

বগলা ক্ষীণ হাসিয়া বলিল—তাতে কি! এখানে থাক্‌তেই যে বেঁচে থাকবো এমন ভরসা কি আপনারা দিতে পারেন? আর ও যখন এসেছে তখন আমাকে যেতেই হবে—

নার্স রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—সত্যিই যাবেন এমন অবস্থায়—

বিপিন বলিল,—তবে তাই ঠিক রইল, আমি বাড়ী ঠিক ক'রে কাল বিকেলে এসে নিয়ে যাবো—

বিপিনের উল্লাসের অন্ত নাই। সমস্ত দুপুর ঘুরিয়া সে বাড়ী, ঝি চাকর সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিল। রান্না, পরিচর্য্যার বাজারের ব্যবস্থা সবই হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্যাক্সি করিয়া বগলাকেও লইয়া আসিল—

সন্ধ্যার পরে আকাশে উজ্জ্বল এককালি চাঁদ উঠিয়াছে—নীল আকাশের বুকে শুভ্র মেঘ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বিপিন বগলার শিয়রে বসিয়া অতীত দিনের নানা কথা বলিতেছিল। বগলা সহসা বলিল,—তোর সে বেহালা কি হ'য়েছে রে?

—ভেঙে গেছে,—তোর কি বেহালা শুনতে ইচ্ছে হয়?

—যখন কাজ নেই, তখন ক্ষতি কি ?

—আচ্ছা কাল একটা কিনবো এখন—

ষ্টোভে রান্না হইতেছিল। বগলার ফরমাইজ অনুসারে খিচুড়ী এবং মাংস তৈয়ারী হইতেছে। বিপিন বলিল,—খাদ্যাখাদ্য বিচার ক'রবার দরকার আছে কি ?

বগলা বলিল,—না, হাসপাতালে আমাকে ইচ্ছামত খেতে দেওয়া হ'তো—

বিপিন একটু ভাবিয়া সহসা বলিল,—বিনোদ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, তাকে আস্‌তে লিখ্‌বো ?

বগলা বলিল,—না থাকগে, পৌছতে পারবে না। ছেলে-পুলে নিয়ে হয় ত সুখেই ঘর-কন্না ক'রছে,—অকারণ বিব্রত ক'রে লাভ কি ?

দুই বন্ধুর অন্তরই সহসা অতীতের মাঝে খেই হারাইয়া ফেলিল। ঘরের মাঝে একটা বেদনার্ত্ত স্তব্ধতা গুমরিয়া মরিতেছে—সোঁ সোঁ করিয়া ষ্টোভ জ্বলিতেছে। বগলা একটু কাশির সহিত রক্ত পিকদানীতে ফেলিয়া বলিল,—জানিস বিপিন, মাধবীকে আজ আমি সত্যিই ক্ষমা করেছি, তার উপর কোন অভিমানই আর নেই ; আমার পক্ষে মরে যাওয়াও যেমন স্বাভাবিক, তার পক্ষে ভুলে যাওয়াও তেমনি স্বাভাবিক। ভালবাসলো না বলে ত' কারও ওপর রাগ করা চলে না—

বিপিন শুনিতেছিল, মাথা না উঁচু করিয়াই বলিল, হুঁ। সহসা যেন উত্তেজনায় অধীর হইয়া বলিল,—ছাখো বগলা, আমার টাকা, আমি রক্ত এবং আয়ুর বিনিময়ে সঞ্চিত ক'রেছি,—এ বৃথা নষ্ট ক'রো না। ব'লছি— মরে যেতে পারবে না কিন্তু। আমি বড় ডাক্তার ডাকছি—টাকা বাজে ব্যয় ক'রতে পারবে না—

বগলা হাসিয়া চুপ করিল। বিপিনের উত্তেজনার কারণ সে

বুঝিয়াছিল। যে মধ্যভারতের জঙ্গলে একান্তে সঞ্চিত যক্ষের ধন লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে বন্ধুকে বাঁচাইবে বলিয়া, সে কেমন করিয়া অনিবার্য্য এই ভবিষ্যৎ বিশ্বাস করিবে।

আর একটি দিনও চলিয়া গেল—

বিপিনের উৎসাহ ব্যস্ততার অবধি নাই—বড় ডাক্তার আসিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন, পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, ঔষধের টাকার অভাব নাই।

নিশীথ রাত্রে সেদিন চাঁদ উঠিয়াছে। খোলা জানালার ভিতর দিয়া একেবারে ঘরের মেঝেয় একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। জানালার পাশে একটা নারিকেল গাছের শীর্ণ পাতা সির সির করিয়া নড়িতেছে,—শিশিরার্দ্র পাতা একটু ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। পৃথিবীর বুকে আজ শুভ্র পবিত্রতার প্লাবন—

বগলার অনুরোধে বিপিন বেহাগ রাগিণী বাজাইতেছিল, নিশীথের নির্জ্জনতায় বিরহবিধুর বেহাগ শুভ্র জ্যোৎস্নার বুকে ফাটিয়া পড়িতেছে,—বগলা সহসা ডাকিল—বিপিন, বিপিন—

বগলা ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—বুকের মাঝে, মাঝে মাঝে যেন থেমে যাচ্ছে, বেদনা ক'রছে—

বিপিন রুষ্টস্বরে বলিল,—তার মানে? তুমি বুঝি এখন মারা যাবে? আমার এত যত্নের টাকা বাজে ব্যয় ক'রে ম'রলে ভাল হবে না, তা ব'লে দিচ্ছি—

বগলা বলিল,—আমি কি ক'রবো, তুমি দেরি ক'রে এলে এখন বেঁচে উঠি কেমনে ক'রে?—এর কোন মানে হয়!

বিপিন জবাব দিল না। রুষ্ট মনে সে পুনরায় বেহালা বাজাইতে

লাগিল। বিড় বিড় করিয়া বলিল,—আমার অর্থ বাজে ব্যয় করার জন্য নয়—

আবার তেমনি করিয়া বেহাগ রাগিণীর করুণ সুর রাত্রির স্তব্ধতাকে ব্যথাতুর করিয়া তুলিল। বিপিন ক্ষণেক পরে ডাকিল—বগলা—

বগলা জবাব দিল না।

বিপিন উঠিয়া বগলার বিছানার ধারে বসিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিল, বগলা—

বগলা জবাব দিল না—

বিপিন সবলে বগলার বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিল,—হতভাগা, মরে যাচ্ছো বুঝি, সে হবে না, আমার টাকা—নিশ্চিন্তে পাড়ি দিচ্ছ যে বড়ো—

বগলার সর্ব্বদেহ এক সঙ্গে নড়িয়া জানাইয়া দিল যে, সে কেবল দেহই, বগলা তাহাতে নাই।

বিপিন আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া, উঠিল—এখন এই রক্তক্রীত টাকা দিয়ে আমি কি করি!

শেষ

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।